প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

পচাগলা ইয়াংকী সংস্কৃতি ধ্বংস করো!

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ
এবং মাও সেতুঙ্-এর
চিন্তাধারা আমাদের
দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

"শ্রেণীসমাজে বিপ্লব ও
বিপ্লবী যুদ্ধ অপরিহার্য"

অষ্টচত্বারিংশৎ খণ্ড
সংখ্যা—১.
আশ্বিন, ১৩৭৬

সম্পাদনায়
শ্রীঅভিজিৎ সেন (সম্পাদক)
শ্রীরেবন্ত ঘোষ (প্রকাশন সচিব)

যাঁদের কাছে পত্রিকা প্রকাশনে সাহায্য পেয়েছি :

স্বপন মালাকার, প্রদীপ মুখোপাধ্যায়, শম্ভু দত্ত
প্রসূন মুখোপাধ্যায়, 'দেশব্রতী'
ও
টেন টীচার্স প্রেসের কর্মীবৃন্দ

ডঃ এস. এন. ঘোষাল, অধ্যক্ষ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, ৮৬/১ কলেজ ষ্ট্রীট
কলি-১২ কর্তৃক প্রকাশিত এবং টেন টীচার্স প্রেসের পক্ষে
শ্রীমায়াদত্ত কর্তৃক ৮/২ ভবানী দত্ত লেন,
কলিকাতা-৭ হইতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

গান্ধী ও তাঁর অহিংস আন্দোলন / সুব্রত মুখোপাধ্যায় ... ১

চীনের সর্বহারার মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব / রেবন্ত ঘোষ ... ৮

রাষ্ট্রের জন্ম / অমিত কুমার ঘোষ ... ১৮

চলচ্চিত্র : সমাজ ব্যবস্থা রক্ষার ভূমিকায় / স্বপন মালাকার ... ৫৮

স্বপ্ন ও সংগ্রাম : অতীত ও আগামী বাংলা সাহিত্য / উৎপল বাহা ... ৭৩

আজকের বাংলা নাটক নিয়ে / সুদীপ্ত রায় ... ৮৯

ভারতের কৃষি বিপ্লব এগিয়ে চলেছে / দীপক পালিত ... ৯৬

ইডেন হোষ্টেলের আবাসিকদের পক্ষ থেকে ... ১২১

আমাদের কথা ... ১২২

গল্প

যাত্রাপথে / অম্লানকুসুম সেনগুপ্ত ... ২৭

স্বাধীনতা / পথিক গুপ্ত ... ৩২

যদি / সোমা সেন ... ৩৬

কবিতা

হাজার কবিতা পড়ে / হো চি মিন ... ৪০

প্রতিরোধ / অপূর্ব মজুমদার ... ৪১

রক্তের কণিকায় ভিয়েৎনাম / দিলীপ রায় ... ৪২

শহীদ বাবুলালের উদ্দেশে / শঙ্কর দাশগুপ্ত ... ৪৩

ইঙ্গিত / কমল কান্তি ঘোষ ... ৪৫

পূবের হাওয়া / প্রমল কুমার সামন্ত ... ৪৭
দু'টি কবিতা / শেখর ভট্টাচার্য্য ... ৪৯
সেই ছেলেটি / শমীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ... ৫১
মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে / সাধন মণ্ডল ... ৫২
ঝড় / অপর্ণা বসু ... ৫৪
শতকী / সিদ্ধার্থ পুরকায়স্থ ... ৫৬
Family planning : A Conspiracy / Sumantra Guha ... 1
The Arguments of Student Unrest : Words for the Authorites / Kalyan Chatterjee ... 5
A Note On Bank Nationalisation In the Context of Indian Political Situation / Tarunkanti Das ... 12
Muhammad-bin-Tuglug Reconsidered / Pijush Chakravarty ... 18
Editorial ... 29

মহান নেতা কমরেড লেনিনের জন্মশতবার্ষিকীতে সংশোধনবাদী এবং নয়া-সংশোধনবাদীদের খতম করার শপথ নিচ্ছি।

মাও সেতুঙ আজকের যুগের লেনিন

"পৃথিবী তোমাদের এবং আমাদেরও কিন্তু অবশেষে তোমাদেরই। তোমরা যুবক, সজীব ও প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল জীবনের স্ফুটনোন্মুখ অবস্থায়, সকালবেলার আট-ন'টার সূর্যের মতো। তোমাদের উপরেই আশা রাখি।"

গান্ধী ও তাঁর অহিংস আন্দোলন

সুব্রত মুখোপাধ্যায়
তৃতীয় বর্ষ, পদার্থ বিদ্যা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণজাগরণের আভাষ পাওয়া গেল। যে সময় মার্কসবাদ পৃথিবীর বিপ্লবী আন্দোলনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একমাত্র হাতিয়ার হিসাবে সশস্ত্র পথকেই সঠিক পথ বলে নির্দ্ধারিত করেছে, সেইসময় নিজেদের ঔপনিবেশিক শোষণের স্বার্থে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা গণআন্দোলন দমন করার এক নূতনতর পন্থার অনুভব করছিল। এমন এক উপায়ের কথা তারা ভাবছিল যে উপায়ে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থের বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন ছাড়াও গণআন্দোলনকে বিভ্রান্ত করা যায়, এমন এক উপায়ের কথা তারা ভাবছিল যে উপায়ে সারা ভারতের গণবিদ্রোহের নেতৃত্ব প্রকৃতপক্ষে তাদের নিজেদের হাতেই রেখে দেওয়া যায়।

ব্যাপক অনুসন্ধান অবশেষে তাদের সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত পথের সন্ধান দিল। তাদের সাম্রাজ্যবাদী ছত্রছায়ায় তারা গড়ে তুলল এমন এক ভারতীয় পার্টি যে পার্টির নেতৃত্ব তাদের বশীভূত, অথচ যে পার্টি ভারতের গণজাগরণে নেতৃত্ব দেবার জন্য এগিয়ে এল। এমনকি এই নির্লজ্জ শাসকেরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সেক্রেটারী হিসাবে বেছে নিল একজন শ্বেতাঙ্গ আমলাকেই যার নাম এ, ও, হিউম। এইভাবে জন্মক্ষণ থেকেই বিশ্বাসঘাতকতার জ্বলন্ত নিদর্শন হিসাবে গড়ে উঠল কংগ্রেস আর প্রতিনিধিত্ব করতে লাগল সাম্রাজ্যবাদীদের আর তাদেরই দালাল দেশীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থের।

১৯১৪-১৫ সাল। মহান লেনিনের নেতৃত্বে সারা রাশিয়া তখন অস্ত্র হাতে তৈরী হচ্ছে আসন্ন শ্রমিক বিপ্লবের জন্য। ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন-এর নেতৃত্বে চীনের জাতীয় বুর্জোয়া সংগঠিত করেছে নিজেকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার জন্য। এক কথায় সারা দুনিয়ার শাসকশ্রেণী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটে বিপন্ন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাও তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কিত। এমনই যখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, তখনই দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল থেকে প্রায় ২০ বছর বাদে ভারতে ফিরে এলেন গান্ধী। এসেই নিজের হাতে তুলে নিলেন কংগ্রেসের নেতৃত্বের দায়িত্বভার। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এমন একজন লোককেই নিজেদের হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে গেল, যাকে তারা বহুদিন ধরেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এমন একজন লোককেই পেয়ে গেল যিনি ভারতীয় জনতার মুক্তির কথা বলবেন, অথচ তাঁদের ইহলোক থেকেই মুক্তির জন্য কোন ব্যবস্থা করতেই কসুর করবেন না।

ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে গান্ধীর চরিত্রে হয়তো বহু সদ্‌গুণের বিকাশের কথা কল্পনা করা যেতে পারে। কিন্তু সঠিক শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গী, সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষের দৃষ্টিকোণ তবুও অন্য কথা বলে। যে 'সাধু প্রকৃতির' ব্যক্তিটির সমস্ত জীবনের কার্যকলাপ পরিচালিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে, গভীরতর করেছিল সারা ভারতের কোটি কোটি মানুষের দুঃখকষ্ট, সুদূরতর করেছিল ভারতীয় জনতার মুক্তি তার চরিত্রে "কিছু কিছু গুণ খুঁজতে যাওয়া" সাধারণ মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে, সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতার দিকে ভারতবাসীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে প্রথম প্রয়োজন গান্ধীর পশ্চাদ্‌মুখী, ভাববাদী, শ্রেণীসমন্বয়বাদী চিন্তাধারার মধ্যে থেকে তাঁদের সম্পূর্ণ মুক্তি।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণআন্দোলন যখন তুঙ্গে উঠল, তখন গান্ধী দর্শনের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা চেষ্টা করল এই আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করতে। গান্ধী নিয়ে এলেন তাঁর "অহিংস" আন্দোলনের লাইন, সশস্ত্র ব্রিটিশ সিংহের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার সামনে নিরস্ত্র ভারতবাসীকে ভেড়ার পালের মত ঠেলে দেবার লাইন। জনগণের এক বিরাট অংশের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা হোল যে গান্ধী একজন মহান জাতীয়তাবাদী নেতা আর আমাদের দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিও হোল এই প্রচারের শিকার। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বের দুর্বলতা ও অনভিজ্ঞতা,

যে কোন রকম আত্মত্যাগে প্রস্তুত ভারতীয় জনতার সামনে প্রকৃত লাইনটি তুলে ধরতে পারার ব্যর্থতাই গান্ধীকে এক সর্বভারতীয় নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল।

গান্ধীর এই অহিংস গণআন্দোলন ধীরে ধীরে আন্দোলনের ধার নষ্ট করে ছিল। গ্রামীণ জনতার স্বাধীন ভাবে লড়াই করার ক্ষমতাকে গান্ধী অস্বীকার করতেন। সমস্ত সময়ের জন্য তাঁর এই ভয় ছিল যে এই লড়াই হয়তো স্বাধীন সশস্ত্র লড়াই-এ রূপ নেবে। সমস্ত সময়ের জন্য তিনি চাইতেন প্রতিটি আন্দোলনে, তাঁর নিজের শ্রেণী, বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্ব চাপিয়ে দিতে, তাঁর পক্ষে এটা ছিল সত্যিই ভয়ঙ্কর। এমনকি তাঁর হীন উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করবার জন্য নানা সময় খোলাখুলি ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি।

১৯২২ সালে চৌরিচৌরার ঘটনা দেশবাসীর সামনে গান্ধীর স্বরূপকে খুলে ফেলতে সাহায্য করল। রাউলাত আইনের 'প্রতিবাদে' গান্ধী যে আইন অমান্য (অহিংস) আন্দোলন চালাচ্ছিলেন তারই অংশ হিসাবে চৌরিচৌরা গ্রামের অধিবাসীরাও আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীশক্তির ক্রম-বর্দ্ধমান অত্যাচার সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছিল এবং অবশেষে জনতা ক্রোধে ফেটে পড়ল। জনতার ক্ষোভে ভস্মীভূত হল স্থানীয় থানা, নিহত হল ২২ জন রাষ্ট্রশক্তির হাতিয়ার পুলিশ। জনতার এই প্রচণ্ড বিপ্লবী শক্তির পরিচয় কিন্তু গান্ধী ভাল চোখে দেখলেন না। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই বিপ্লবী সংগ্রাম আর চলতে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি তুলে নিলেন তাঁর আন্দোলন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শিকড়ে আঘাত করতে পারত যে বিপ্লবী আন্দোলন, তাকে স্তব্ধ করে দিয়ে গান্ধী আর একবার প্রমাণ করলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষাই তাঁর প্রধান কাজ।

ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা দেখি ১৯৩০-এ পেশোওয়ারের ঘটনায়। পেশোওয়ারের একদল সৈন্য জনতার উপর গুলী চালাতে অস্বীকার করে অস্ত্রত্যাগ করল। দেশবাসী মাত্রই এই ঘটনায় আনন্দ বোধ করল, সৈন্যবাহিনীতেও সাড়া পড়ে গেল। গান্ধী কিন্তু এইসময় বিস্ময়কর ভাবে এই ঘটনার নিন্দা করেন ও বলেন যে সৈন্যদল নাকি নীতিভ্রষ্ট হয়েছে। জনতার উপর গুলী চালানকেও গান্ধী 'সুষ্ঠু নীতি' হিসাবে মনে করতেন না কি ?

তিরিশের দশকে ভারত যখন এক গণআন্দোলনের পর্য্যায়ের মধ্য দিয়ে চলেছে তখন গান্ধী ছুটে গেলেন লণ্ডন। সেখানকার ব্রিটিশ বড় কর্তাদের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকে তিনি আলোচনা করে ঠিক করে ফেললেন তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। সমস্ত বোঝাপড়ার শেষে ভারতে এসে আবার আরম্ভ করলেন তাঁর অহিংস গণআন্দোলন যা জনতার দৃষ্টিকে আবার প্রকৃত পথের থেকে অন্য দিকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

এই সময় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে একটি বামপন্থী উপদল ক্রমেই শক্তিসঞ্চয় করছিল। গান্ধীর অনুসরণকারীদের সঙ্গে এই দলটির সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ছিল। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে এই দলটি বিপ্লবী কর্মধারা রূপায়ণের কথা চিন্তা করছিল। কিন্তু গান্ধী আঁকড়ে পড়ে রইলেন তাঁর সেই মধ্যযুগীয় একগুঁয়ে শ্রেণীসমন্বয়বাদী মতবাদ। ফলে কংগ্রেসের মধ্যে দেখা দিল এক অভিনব সঙ্কট। ত্রিপুরী কংগ্রেসে কংগ্রেস-সভাপতিপদে নির্বাচিত হলেন সুভাষচন্দ্র। বামপন্থী মতবাদের এই আশার দিনে গান্ধী কিন্তু নানা কৌশলে ও তাঁর 'বিশেষ' ক্ষমতার বলে বিতাড়িত করলেন সুভাষচন্দ্রকে, আর সভাপতি হলেন তাঁরই মনোনীত প্রার্থী। রবীন্দ্রনাথের মত মনীষীকে যখন আমরা দেখি সুভাষচন্দ্রকে বাংলাদেশের হয়ে দেশনায়কের পদে বরণ করে নিতে, ঠিক সেই সময়ই গান্ধী কূটকৌশলে বিতাড়িত করলেন সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে।

এই ধরণের সমস্ত ঘটনাই প্রমাণ করে দেয় যে গান্ধীর অহিংস আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে জনগণের সংগ্রাম দমন করার এক সুবিশ্বস্ত হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তবিক পক্ষে গান্ধী সমস্ত সময়ই চেষ্টা করতেন পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে ও জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃষকশ্রেণীর সংগ্রামকে বিপথে চালিত করতে এবং এটা তিনি করে গেছেন ধনিকশ্রেণীর হৃদয় পরিবর্তনের নাম করে ও শ্রেণীসমন্বয়বাদী উদ্দেশ্যমূলক চিন্তাধারা দিয়ে (যে চিন্তাধারা আজও আমাদের দেশে সংশোধনবাদের রূপ ধরে রয়েছে)।

পাশ্চাত্যের এক বিরাট মনীষী রঁম্যা রলাঁ। ইউরোপের চিন্তায় এক নবজাগরণের দিনে আমরা রলাঁকে দেখেছি ভবিষ্যৎ ইউরোপের, সুন্দরতম ইউরোপের চিন্তাকে নিয়ে পৃথিবীর সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে। ভাববাদ ও অতীন্দ্রীয়বাদের বেড়াজালে প্রথম জীবনে আবদ্ধ থেকেও যে কয়জন চিন্তাবিদ

পরবর্তীকালে আয়ত্ব করতে পেরেছেন সমাজতন্ত্র ও সর্বহারা একনায়কত্বের মূলমন্ত্রকে রলাঁ তাঁদেরই একজন। এখানে তাঁর কথা উল্লেখ করছি এইজন্য যে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, বিবেকানন্দ ইত্যাদি বহু প্রাচোর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মূল্যায়ন করতে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি। তাই মনে হয় যে গান্ধী সম্বন্ধে তাঁর মূল্যায়নের কথা উল্লেখ না করলে এ প্রবন্ধ হয়তো অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

প্রথমজীবনে গান্ধীর আদর্শ রলাঁর মধ্যে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল, গান্ধীকে দেখে তিনি এইসময় বিরাট মহাত্মার আত্মবলের কথা কল্পনা করেছেন। কিন্তু চিন্তার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি গান্ধীর সততায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। একসময় তাই তাঁকে বলতে শুনি, "গান্ধী একজন আদর্শবাদী জাতীয়তাবাদী, একজন আন্তর্জাতিক নন।" ভবিষ্যতে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁকে বলতে শুনি "এই বৃদ্ধ একগুঁয়ে লোকটি তাঁর ভুলভ্রান্তি এতটুকু সংশোধন করবেন না।.....বাস্তবিক পক্ষে এই লোকটি হচ্ছেন একটি অশ্বতর (mule), একটি সাধুপ্রকৃতির অশ্বতর। তিনি নিজে কাউকে তাঁর মতে টানতে পারেন না, নিজের মতও বদলাবেন না।" (Inde, p. 231)

রলাঁ দেখিয়েছেন গান্ধীর উপর তাঁর অসীম বিশ্বাস কিভাবে গান্ধীরই নিজদোষে ধীরে ধীরে মুছে গেছে। অহিংসার নামে চিৎকার করে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেছিলেন যে গান্ধী, অত্যন্ত গর্বভরে যিনি বলেছিলেন, "সকল প্রকার হিংসার পন্থা আমার চিন্তার বিরোধী," সেই গান্ধী যখন বুয়র যুদ্ধে ইংরেজের দাসত্ব ও সহযোগিতা করে 'কিংজর্জ মেডেল' পান, সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বযুদ্ধে যখন ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করার পন্থা নেন তখন রলাঁর মনে সন্দেহ ঘনীভূত হয়। তিনি লিখছেন, "১৯১৪ সালের যুদ্ধ সম্বন্ধে গান্ধীর মনোভাব ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধে সহযোগিতার সঙ্গে তাঁর অহিংসানীতির সামঞ্জস্য বিধান তাঁর পাশ্চাত্য অনুরাগীদের মনে যথেষ্ট সংশয়ের সৃষ্টি করেছে।" ইংরেজ সরকারের দাসত্বই যে ছিল গান্ধীর প্রধান উদ্দেশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয়দের অংশগ্রহণ সম্পর্কে তাঁর মনোভাবই সেকথা প্রমাণ করে দেয়।

'অহিংসা' যে গান্ধীর কাছে কোনো আদর্শ ছিল না, এটা যে ছিল শুধু সংগ্রাম ধ্বংস করবার হাতিয়ার মাত্র, তার আরও প্রমাণ পাওয়া গেল গান্ধীর ইতালী ভ্রমণে। লক্ষ লক্ষ মানুষের হত্যাকারী ফ্যাসিষ্ট মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাতে তাঁর

বিন্দুমাত্র দ্বিধা হল না, চারিদিকে নানা প্রতিবাদ সত্ত্বেও। অথচ রাশিয়া ভ্রমণের সময় তার 'অহিংসা' নামক আজব ভূতটির সাহায্য আবার তিনি নিলেন। 'হিংসার দেশ' বলশেভিক রাশিয়ায় যেতে নীতিগতভাবে আপত্তি জানালেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখছেন, "বলশেভিজম কি সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ।" এর পরই তাঁর মন্তব্য, "সুতরাং বলশেভিজম ও আমার মধ্যে কোথাও এতটুকু মিল নেই।" (রলাঁর প্রতি পত্র, Inde, P. 63) পাঠক হয়তো বুঝবেন বলশেভিজম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়েও কিভাবে হঠাৎ তিনি ধরে ফেললেন যে তাঁর সঙ্গে বলশেভিজমের এতটুকু মিল নেই!

রবীন্দ্রনাথও রাশিয়া সম্বন্ধে নানা কুৎসা শুনেছিলেন, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী প্রচার তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারে নি। অসীম আগ্রহ নিয়ে তিনি গিয়েছিলেন সেই দেশে যে দেশ "অন্য কোন দেশের মতই নয়।" যেখানে "একেবারে মূলে প্রভেদ।" "আগাগোড়া সকল মানুষকেই" বলশেভিকরা যেখানে "সমান করে জাগিয়ে তুলছে।" রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় দেখেছেন "পূর্বেকার সমাজের অসংখ্য নির্যাতিত, অপমানিত, যারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকত,—উপরের সবাই আলো পেত, আর তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ত, যারা উপবাসে মরত, সেই সব মানুষের কল্যাণে কি বিপুল উদ্যম"। তিনি বলেছেন এখানে "না এলে জন্মের তীর্থ দর্শন অসমাপ্ত থাকত।" আর সেই রাশিয়ায়ই ভ্রমণ করতে গান্ধী হলেন অনিচ্ছুক আর পরিবর্তে তিনি গেলেন তাঁর মতে 'অহিংসার দেশ' ইতালিতে। ইতিহাস রসিকও বটে।

রলাঁ সাক্ষাত করেছিলেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের সঙ্গেও। গান্ধী সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের অভিমত রলাঁ এইভাবে প্রকাশ করেছেন, "জগদীশচন্দ্র গান্ধীকে ভালভাবেই জানেন·····কিন্তু তিনি মনে করেন গান্ধী অত্যধিক সঙ্কীর্ণমনা। তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় পবিত্র আত্মিক ঐশ্বর্যের একান্ত অভাব।" বিবেকানন্দের সঙ্গে তুলনা করে রলাঁ বলেছিলেন, "বিবেকানন্দ ছিলেন একজন মনীষী, আর মনীষা গান্ধীর বিন্দুমাত্রও ছিল না।"

এই সুবিধাবাদী আত্মসর্বস্ব মানুষটি, যিনি বলতে পেরেছিলেন, "আমি যাহা পাইতে চাই, যাহা আমি গত ৩০ বৎসর ধরিয়া খুঁজিয়া আসিতেছি, সে আত্মদর্শন, সে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার, অথবা মোক্ষ।·····আমি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে

যখন যে কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ি তাহারও পিছনে থাকে ঐ একই ইচ্ছা।" সত্য সত্যই ভারতের অতীত সংগ্রামের বহু ক্ষতি করেছেন এবং ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ মুক্তি সংগ্রামে এঁর চিন্তা আরও বহু ক্ষতি করতে পারে যদি এর বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রামে আমরা ব্যর্থ হই।

গান্ধীবাদ আজও স্বনামে ও বেনামে ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে বহু বাধার সৃষ্টি করছে। কংগ্রেসীরা, যাদের আজকে সাধারণ মানুষ জঞ্জালের মত বর্জন করেছে, তারাও বিশ বছর ধরে গান্ধীর নাম সামনে রেখে চালিয়েছে নিপীড়ন ও শোষণ। গান্ধীর 'সহজভাবে বেঁচে থাকার' নীতি কতজন কংগ্রেস নেতা পালন করেছেন আমরা জানিনা, তবে এটা আমরা দেখেছি জনসাধারণের টাকায় গান্ধীবাদীদের প্রাসাদ বড় হয়ে উঠেছে, তারা আরামকেদারায় ঠেস দিয়ে মাঝে মাঝে 'সমাজতন্ত্র' 'সমাজতন্ত্র' বলে বিলাপ করেছেন। যাইহোক এইসমস্ত গান্ধীবাদীদের আজ জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব খুবই কম। কিন্তু বিপদ দেখা দিয়েছে অন্য জায়গায়। এতদিন যারা কংগ্রেসী কুশাসনের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন পরিচালনা করার কথা উচ্চস্বরে ঘোষণা করে এসেছেন, 'বিপ্লব', 'বিপ্লব', বলে আকাশ বাতাস ফাটিয়ে দিয়েছেন, আজ তারাই আবার গান্ধীবাদের হয়ে উমেদারী করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টিও আজ গান্ধী জন্মশতবার্ষিকী পালনের জন্য জোরদার প্রচার চালাচ্ছে। দেশের বড় বড় 'বিপ্লবীরা' আজ অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সংবিধানকেই চূড়ান্ত বলে ধরে নিয়েছে, 'আইন অমান্য আন্দোলনই' আজ তাদের একমাত্র পথ। মুখে শ্রেণীসংগ্রামের নাম করে শ্রেণীসমন্বয়ের চূড়ান্ত করতে তারা আজ কুণ্ঠাহীন, দ্বিধাহীন। মালিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্বে এরাও আজ সর্বহারা শ্রমিককে দোষী সাব্যস্ত করে মালিকের পক্ষ নিয়েছে ও নিচ্ছে।

গান্ধীবাদ ও গান্ধীবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ আজ তাই নূতন পৃথিবীর পথিকদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হোল সশস্ত্র সংগ্রাম। আজ তাই প্রতিটি মধ্যবিত্ত যুবককে উপলব্ধি করতে হবে গান্ধীবাদের প্রকৃত স্বরূপ, প্রচার করতে হবে সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি আর কোটি কোটি ভারতবাসীকে বার করে নিয়ে আসতে হবে গান্ধীবাদী পিঞ্জরের ভেতর থেকে। ভারতের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল প্রচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে গান্ধী শতবার্ষিকীতে এটাই হবে আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ।

———

চীনের সর্বহারার মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব

বিপ্লবী অভিনন্দন এবং প্রতিবিপ্লবী আর্তনাদ

রেবন্ত ঘোষ
তৃতীয় বর্ষ, উদ্ভিদবিদ্যা

"অস্ত্রসজ্জিত শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার পরও নিরস্ত্র শত্রু তবু থেকে যায়। তারা মারয়ার মতো আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে বাধ্য। আমরা নিশ্চয়ই হাল্কাভাবে এদের কখনোই নেবো না। এইভাবে যদি আমরা এখন এই প্রশ্ন না তুলি ও না বুঝি তবে মারাত্মক ভুলই করবো।"—সভাপতি মাও সে তুং-এর এই ঐতিহাসিক উক্তির যদি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সত্যতা থাকে তাহলেই বুঝতে হবে যে চীনের সর্বহারার মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব শ্রমিক একনায়কত্বকে মজবুত করার এবং পুঁজিবাদের পুনরাবির্ভাব রোধের ও সমাজতন্ত্র গঠনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন এবং সবচেয়ে সময়োপযোগী। আর তা যদি না হয় তবে নিকিতা ক্রুশ্চভের "সমস্ত লোকের রাষ্ট্র" (ক্ষমতাহারা বুর্জোয়া এবং সর্বহারা—উভয়েরই—মন্তব্য লেখকের) এবং 'চীনের ক্রুশ্চভ' লিউ-শাও-চি'র "শ্রেণীসংগ্রামের মৃত্যু" (Dying out of class struggle) তত্ত্বটা যে কতদূর সত্যি তা প্রমানিত হবে। অথবা মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতির ফলে চীন মাওপন্থীদের কাঁটা সংস্কৃতি বিপ্লবের খালে পড়েছে—৫ই জুলাই ১৯৬৯ সালের "সোভিয়েত সমীক্ষা"র এই উক্তিটিকে সত্যি বলে মেনে নিতে হবে।

সাধারণ একটা উদাহরণের মারফত দেখা যাক আজকের যুগে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সত্যিকার উত্তরাধিকারী কে? সভাপতি মাও সে-তুং, না নিকিতা ক্রুশ্চভ ব্র্যাণ্ডেরা?

মনে করুন আপনি একটা বাগানের "আপেল ফলগুলো" বেশ আরামের সঙ্গে একাই খেতেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন পরে আপনার একচেটিয়া ভোগে বাধা পড়ল। আপনার বাগানে যে সব 'মালিরা' সারাদিন পরিশ্রম করে এই গাছ গুলোতে ফল ফলিয়েছে তাঁরা এই গাছগুলোর উপর তাঁদের দাবিকে প্রতিষ্ঠা করলেন। তখন আপনার "স্বর্গ হতে বিদায়" ঘটল। আপনি কি আবার "স্বর্গ পুনরুদ্ধার" করতে চাইবেন না? নিশ্চয়ই চাইবেন। তাহলে আপনি কি করবেন? সহজ কথায় "স্বর্গ" ফিরে পাবার জন্য আপনি ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করবেন। ষড়যন্ত্রে আপনার সঙ্গী হবে তারাই যারা (মুষ্টিমেয়) আপনার মতো "আপেল ফল"-এর অসৎ মালিকানা হারিয়েছে। এ লড়াই আরও মারাত্মক। কারণ এ হচ্ছে একটা ঠাণ্ডা লড়াই। এখন "মালিরা" যাঁরা আপেল গাছের মালিকানা লড়াই-এর মধ্য দিয়ে লাভ করেছেন, তাঁরা যদি আপনার (পূর্বোক্ত অসৎ মালিক) আপেল ফল-এর উপর দাবিকে মেনে নেয়, তাহলে আপনি আপনার ষড়যন্ত্রের একটা আরও লাভজনক উপায় খুঁজে পাবেন।

তা হলেই বলুন পরাজিত শোষকের সঙ্গে (যে শ্রেণী-আধিপত্যের যন্ত্র হাতাবার চেষ্টায় আছে) বর্ত্তমানের শ্রেণী-আধিপত্যের যন্ত্রের অধিকারী সর্বহারা শ্রেণী হাত মেলাবেন, না, তাকে শেষ না করা অবধি লড়াই চালিয়ে যাবেন? সোজা উত্তর, শত্রুকে শেষ না করা অবধি নিজের অধিকারকে রক্ষা করার প্রশ্নই ওঠে না।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখুন মহান চীনের সর্বহারার মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে।

০ ০ ০ ০ ০ ০

পৃথিবীতে কতকগুলো স্মরণীয় নাম আছে। 'লেনিন' নিঃসন্দেহে তার মধ্যে একজন। ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে পড়েও সংশোধনবাদীরা এই স্মরণীয় নামটির দোহাই পেড়ে নিজেদের পচা দুর্গন্ধের ওপর 'লেনিন' নির্য্যাসের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এতদূর অবধি এগিয়েছে যে মহান মাও সেতুং-এর নেতৃত্বে পরিচালিত মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিরোধিতা করতে গিয়ে লেনিনবাদকে অবধি বিকৃত করতে ছাড়েনি। পৃথিবীর চিরকালের বিপ্লবী মহান লেনিনকে 'শ্রেণী সমন্বয়ের

প্রেমের ঠাকুর' অবধি বানাবার অপচেষ্টা করছে। অথচ মহান লেনিন একাধিক বার বলেছেন—

১) ক্ষমতাহারা শোষকেরা তাদের 'স্বর্গ' ফিরে পাবার জন্যে সহস্রবার চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

২) পুঁজিবাদের চিন্তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সদাসর্বদা মধ্যবিত্ত আবহাওয়ায় ঘোরাফেরা করবে।

৩) 'রাজনৈতিক বেশ্যারা' এবং নতুন বুর্জোয়ারা শ্রমিক শ্রেণী এবং গভর্নমেন্টের বিভিন্ন দায়িত্ব থেকে বুর্জোয়া ধ্যানধারণা ছড়িয়ে মধ্যবিত্ত আবহাওয়াকে দূষিত করবে।

৪) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শ্রেণীসংগ্রামকে শান্তিপূর্ণ পথে আনার জন্য আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদীরা সশস্ত্র আক্রমণের হুমকী দেবে এবং কুৎসা রটনা করবে।

মহান লেনিনের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের সত্যতা শোধনবাদীরা উপলব্ধি করতে না পারলেও মহান চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি এবং তার কর্ণধার সভাপতি মাও-সে-তুং ভুল করেন নি।

মহান লেনিন আরও বলেছেন—"পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণটা একটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক অধ্যায়। যতদিন এই অধ্যায় শেষ না হচ্ছে ততদিন শোষকেরা অনিবার্য্যভাবেই ক্ষমতা পুনর্দখলের আশা পোষণ করে, এই আশা পুনর্দখলের চেষ্টায় পরিণত হবে।" (সর্বহারা বিপ্লব ও দলত্যাগী কাউটস্কী)

লেনিন যেখানে বলেন, "(বুর্জোয়ার) আশা পুনর্দখলের চেষ্টায় পরিণত হবে" সেখানে নিকিতা ক্রুশ্চভের "সমস্ত লোকের রাষ্ট্র" (state of the whole people) এবং 'চীনের ক্রুশ্চভ' লিউ শাও চি'র "শ্রেণী সংগ্রামের মৃত্যু" (Dying out of Class struggle) কার স্বার্থে—বুর্জোয়ার না সর্বহারার?

আর মহান মাও বলেন—"বুর্জোয়াদের সেই সব প্রতিনিধি যারা আমাদের পার্টি, গভর্ণমেন্ট, মুক্তিবাহিনী এবং সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে গোপনে প্রবেশ করেছে তারা হচ্ছে প্রতিবিপ্লবী, শোধনবাদী। যখন সময় তাদের অনুকূল হবে তখন তারা ক্ষমতা পুনর্দখল করবে এবং সর্বহারার একনায়কত্বকে বুর্জোয়া একনায়কত্বে পরিণত করবে। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে আমরা খুঁজে পেয়েছি এবং

অন্যদের এখনও পাই নি। তাদের মধ্যে অনেককেই এখনও আমরা বিশ্বাস করছি এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উত্তরাধিকারী হিসাবে তারা শিক্ষা নিচ্ছে। আমাদের মধ্যে থেকে 'ক্রুশ্চভ চিহ্নিত' পাখীর বাচ্চারা বড় হচ্ছে। পার্টি কমিটির সমস্ত ক্ষেত্রে এদের সম্বন্ধে সর্বতোভাবে দৃষ্টি রাখা উচিত।"

("রেডফ্ল্যাগ" এবং "পিপলস ডেইলী" পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে)

শ্রেণী সংগ্রামের প্রতি অতন্দ্র দৃষ্টি রেখে মহানচীনের কমিউনিষ্ট পার্টির মহান কর্ণধার মাও সে তুং হুসিয়ার করে দেন : যদি বিভিন্ন শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের কথা ভুলে যাওয়া হয় এবং যদি সর্বহারা শ্রমিক একনায়কত্বের কথা ভুলে যাওয়া হয়,

"তা হলে বেশীদিন লাগবে না, হয়তো কয়েক বছরের মধ্যে, কিংবা এক দশকের মধ্যে, কিংবা খুব বেশী হলে কয়েক দশকের মধ্যেই সারা জাতি জুড়ে প্রতি-বিপ্লবী পুনঃপ্রতিষ্ঠা অনিবার্য্যভাবেই ঘটবে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি নিঃসন্দেহে একটি সংশোধনবাদী পার্টি কিংবা একটি ফ্যাসিস্ত পার্টিতে পরিণত হয়ে যাবে এবং চীনের রঙ পালটে যাবে। কমরেডগণ, ব্যাপারটা আবার ভেবে দেখুন! কি সাংঘাতিক অবস্থা হবে!"

বহুদিন যাবৎ শোষণের যন্ত্রটি কব্জা করে রাখার দরুন 'সংস্কৃতি' নামক উপরি সৌধের অস্ত্রটিও বুর্জোয়ারা বেশ ধারাল করেছিল। যখন অর্থ নৈতিক কর্তৃত্ব হারায় তখন বুর্জোয়াদের অবলম্বন হয়ে পড়ে চিনি মাখানো বুর্জোয়া সংস্কৃতির বুলেটটি। কাজে কাজেই সর্বহারার একনায়কত্বকে মজবুত করতে হলে সর্বহারার মহান সাংস্কৃতিক অস্ত্রটিকেও মজবুত করতে হবে। সেই হিসাবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে সর্বহারার মতাদর্শের সংগ্রাম শ্রেণী সংগ্রামেরই অংশ— অন্ততঃ এটাই মনে করা সঙ্গত, যদি মার্কস এবং লেনিনের বৈজ্ঞানিক মতবাদকে অস্বীকার করতে না হয়।

শ্রেণী সংগ্রামের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে মহানচীনের মুক্তিফৌজের দৈনিক পত্রিকার ১৮ ই এপ্রিল ১৯৬৬ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয় "সর্বহারা যদি সাংস্কৃতিক মূলকেন্দ্রগুলি দখল না করে তবে বুর্জোয়ারা করবে। এ এক তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম। যেহেতু আমাদের দেশে বুর্জোয়া শক্তির অবশিষ্টাংশ এখনও বেশ বড়, যেহেতু এখনো অনেক বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী রয়েছে, যেহেতু বুর্জোয়া

মতাদর্শের প্রভাব এখনো বেশ তীব্র এবং যেহেতু আমাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের কায়দা ক্রমেই বেশি চতুর ও গোপন হয়ে উঠছে সেহেতু যে সংগ্রাম চলেছে তাকে দেখতে পাওয়াই আমাদের পক্ষে কঠিন। যদি আমরা আমাদের প্রহরা শিথিল করি অথবা বিন্দুমাত্র বিশ্রাম নিতে উদ্যত হই, তবে আমাদের শক্তিকেন্দ্রগুলি হারাতে পারি। এ দিক থেকে দেখলে কে জিতবে, সমাজতন্ত্র না পুঁজিবাদ, সে প্রশ্নের এখনো মীমাংসা হয় নি। এ সংগ্রাম অনিবার্য্য। একে সঠিকভাবে পরিচালনা না করতে পারলে সংশোধনবাদের উত্থান ঘটবে।"

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

কিন্তু এই সব বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই হবে ?

মতাদর্শের ক্ষেত্রে লড়াই-এর হাতিয়ার হলো প্রচার।

সর্বহারার ক্ষমতা দখলের পর প্রচারের ধারা সম্বন্ধে লেনিন বলেছেন—"প্রচার মারফত জনতাকে পৌঁছে দিতে হবে পূর্ববর্তী বিপ্লবগুলির শিক্ষা, সেই সব বিপ্লবে প্রতিবিপ্লবীরা চরমবাদী বিপ্লবী পার্টির সবচেয়ে কাছে যে বিরোধী দল ছিল তাদের সমর্থন করে বিপ্লবী একনায়কত্বকে কাঁপিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল এবং এইভাবে প্রতিবিপ্লব তথা পুঁজিপতি ও জমিদারদের চূড়ান্ত বিজয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল।"

এই পৃথিবীতে দু'ধরণের মতাদর্শ আছে—বুর্জোয়া মতাদর্শ এবং সর্বহারার মতাদর্শ। সর্বহারার রাজকে শক্তিশালী করে শ্রেণীহীন সমাজ গড়ার পথে এগিয়ে যেতে হলে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই হবে। আর তারই অমোঘ নিয়মে জন্ম নিয়েছে মহান চীনের সর্বহারার মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

সর্বহারার সংস্কৃতিগত প্রচারের মূল হচ্ছে—"জনতা থেকে জনতার কাছে যাওয়া" (From the masses to the masses)। জনসাধারণই বিচার করে দেখবেন কোনটা সঠিক—বুর্জোয়া মতাদর্শ না সর্বহারার মতাদর্শ ? জনসাধারণের প্রতি এতো বিশ্বাস ও এতো আস্থা চীনের কমিউনিষ্ট পার্টিকে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সঠিক নেতৃত্বের আসনে বসিয়েছে। চীনই

প্রথম দেশ যেখানকার কোটি কোটি জনসাধারণ প্রকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলোচনা বিতর্কের মধ্যে দিয়ে ভুল ও বিচ্যুতিগুলোকে তুলে ধরেছে। সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সমালোচনা করেছে পূর্ণ অধিকারে। কেন এত বেশীভাবে জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করেছেন সাংস্কৃতিক বিপ্লবে? এর একটা মাত্রই উত্তর হচ্ছে চীনের কমিউনিষ্টপার্টি জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়—চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যরা প্রতিদিনই জনসাধারণের শিক্ষক, আবার প্রতিদিনই জনসাধারণের ছাত্র—বলেছেন মহান মাও সেতুং। সভাপতি মাও আরও বলেছেন—"আমরা কমিউনিষ্টরা হচ্ছি বীজের মতো, জনগণ হচ্ছেন জমির মতো। আমরা যেখানেই যাই না কেন, সেখানকার জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত হতে হবে, জনগণের মধ্যে শিকড় গাড়তে এবং প্রস্ফুটিত হতে হবে।"

১৯৬৬ সালের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পদ্ধতি সম্বন্ধে চীনের মুক্তিফৌজ পত্রিকার সম্পাদকীয়তে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে—"আমাদের উচিত সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে জনতাকে বিপ্লবী ও জঙ্গী সমালোচনায় উদ্বুদ্ধ করা, কয়েক জন সমালোচকের সাহিত্য ও শিল্প সমালোচনার এক চেটিয়া অধিকার ভেঙ্গে দেওয়া। শিল্প সাহিত্য সমালোচনার অস্ত্রটি দিতে হবে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিক সাধারণের হাতে।" এ উক্তিটি দেখে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা হয়তো চিন্তা করবেন, এ কি করে সম্ভব! ঐ কারখানার শ্রমিক আর হাড়জিরজিরে কৃষকদের আধিপত্যে থাকবে 'কালচার' জিনিষটা। কিন্তু বুর্জোয়াদের চিন্তা-ধারায় কুঠারাঘাত করে ১৯৪২ সালে ইয়েনান ফোরামে সভাপতি মাও ঘোষণা করেন—"আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকলা হচ্ছে জনসাধারণের জন্য, প্রথমতঃ শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের জন্য, শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যদের জন্যই এগুলো রচিত হয় এবং এ-গুলোকে শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যরাই ব্যবহার করেন।"

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির পরিষ্কার নির্দেশ যে বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণার তল্পিবাহক কোনও ব্যক্তির উপরে যেন বলপ্রয়োগ না করা হয়। তাদের যেমন কাজের সমালোচনা করা হবে—তেমনি সংশোধনের সুযোগ দিতে হবে। এ ব্যাপারে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি সভাপতি মাও-এর ঐতিহাসিক উক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। সভাপতি মাও পরিষ্কার ভাবে বলেছেন—"ত্রুটি উদ্ঘাটনে এবং দোষ সমালোচনায় আমাদের উদ্দেশ্য আর রোগীর চিকিৎসায়

ডাক্তারের উদ্দেশ্য এক। কারুর এপেণ্ডিসাইটিস হলে সার্জন এপেনডিকসটি কেটে বাদ দিয়ে দেন, রোগী সেরে ওঠে। যে রোগী ভুল করেছে তাকে চিকিৎসা গ্রহণে স্বাগত জানাতে হবে, যদ্দিন না সেরে উঠে, একজন ভালো কমরেড হয়—অবশ্য যদি সে ওষুধ খাওয়ার ভয়ে রোগ গোপন না করে এবং ভুল করতে করতে সংশোধনের বাইরে না চলে যায়। যদি সে সৎ ও আন্তরিক ভাবে চিকিৎসা চায়, তাহলে তাকে রোগমুক্ত করা সম্ভব। তাকে প্রাণভরে গালাগাল দিয়ে অথবা আচ্ছা করে ঠেঙিয়ে রোগমুক্ত করা যায় না। মতাদর্শ বা রাজনৈতিক রোগের চিকিৎসা করতে গেলে হিংসার আশ্রয় নেওয়া উচিত নয়। 'রোগের চিকিৎসা করে রোগীকে বাঁচাও'—এই একমাত্র সঠিক ও কার্য্যকরী দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের গ্রহণ করা উচিত।"

কিন্তু তা সত্ত্বেও ওয়াং মিং নামক চীনের কমিউনিষ্ঠ আন্দোলনের অনিষ্টকারী ব্যক্তিটিকে লিখতে দেখি সাংস্কৃতিক বিপ্লবে নাকি বহু ব্যক্তিকে "গ্রেপ্তার" "হত্যা" ইত্যাদি করা হয়েছে। [তথাকথিত ক্যানাডিয়ান কমিউনিষ্ট পার্টির তাত্ত্বিক পত্রিকা "ক্যানাডিয়ান ট্রিবিউন"-এ ১৯শে মার্চ ১৯৬৯ তারিখে লেখা ওয়াং মিং-এর "চীনঃ সাংস্কৃতিক বিপ্লব না প্রতিবিপ্লবী আঘাত" নামক বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবী কুৎসা রটনায় পঞ্চমুখ প্রবন্ধ থেকে।]

সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা এবং সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী সোভিয়েত রাশিয়া তো চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিপক্ষে আরব্য উপন্যাসের থেকেও আজগুবি অনেক তত্ত্বই বিশ্ববাসীকে পরিবেশন করার দায়িত্ব নিয়েছে। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে নিয়ে অসৎ প্রচারের কারখানা তৈরী হয়েছে হংকং-এ। হংকং-এ তৈরী চোলাই মদের ছিটে ফোটা আমাদের দেশের বুর্জোয়া পত্র পত্রিকাগুলো পেয়ে থাকে। তা না হলে লিখতে পারে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে চীনে ড্রামে করে মানুষ সিদ্ধ করা হচ্ছে!

ওয়াং মিং আর তার প্রভুরা জবাব দিতে পারবে না বুর্জোয়া পথের এক-নম্বর পথিক বিশ্বাসঘাতক দলত্যাগী লিউ শাও চি'কে হত্যা করা হয়েছে কিনা। কিন্তু চীনের কমিউনিষ্টপার্টি লিউ শাও চি'র শয়তানী কেতাব "আত্ম অনুশীলন" (Self Cultivation)-কে সমালোচনা করেছে "আত্ম অনুশীলন"-এর তত্ত্বকে তুলে ধরেই। চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি চ্যালেঞ্জ করতে জানে। কারণ তারা

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওসে-তুং-এর চিন্তাধারার তাত্ত্বিক অস্ত্রে বলীয়ান এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্যথা করে না।

সেভিয়েত রাশিয়া, তুমি লিউ-শাও-চি'র "Dying out of Class Struggle"-এর বঙ্গানুবাদ "শ্রেণী সংগ্রাম ক্ষীণ হওয়া" ("সেভিয়েত সমীক্ষা" ৩০শে মে, ১৯৬৯) করে লিউ শাও চি'কে আবরণ করার অপচেষ্টা করতে পার কিন্তু লিউ শাও চি পৃথিবীর মুক্তি যোদ্ধাদের কাছে বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হয়ে গেছে—এটা কখনোই সম্ভব হতো না যদি মহান চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি'র নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালিত না হতো।

"সংস্কৃতি বিপ্লব" সংস্কৃতিক্ষেত্রে চীনকে পেছনের দিকে নিয়ে গেছে এবং দেশের সামনে নিয়ে এসেছে গুরুতর অর্থনৈতিক অসুবিধা, জনগণের নিম্ন জীবন-মানকে আরো নিম্নগামী করেছে এবং বহুদেশে প্রগতিশীল মহলে সভ্যরাষ্ট্র হিসেবে তার মর্যাদাকে গুরুতররূপে ক্ষুণ্ণ করেছে। ["সেভিয়েত সমীক্ষা" পৃষ্ঠা ৩৪, ৫ই জুলাই, ১৯৬৯] ওহে "সেভিয়েত সমীক্ষা", তোমার দেশের পত্রপত্রিকায় অর্ধনগ্ন নারীর ছবি ছাপিয়ে তুমি আমেরিকান বুর্জোয়া সংস্কৃতির সঙ্গে একসারিতে দাঁড়িয়ে 'প্যারেড' করে যাও—এরকম নেতিবাচক প্রগতি চীনে নাই বা হলো!

ওহে জ্ঞানপাপী সংশোধনবাদী পণ্ডিত ই, ওয়াই, বাতালোভ, তোমার "গুরুতর অর্থনৈতিক অসুবিধা"-র মুখে চপেটাঘাত করে মহান চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি'র নবম কংগ্রেসে জনযুদ্ধের জননায়ক লিন পিআও ঘোষণা করেছেন—"আমাদের দেশ এমন এক সমাজতান্ত্রিক দেশ যার ভেতরের ও বাইরের কোথায়ও দেনা নেই" ['দেশব্রতী' প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত সহ-সভাপতি লিন পিআও-এর রিপোর্টে'র বঙ্গানুবাদ। পৃষ্ঠা—২৯]

ওহে বাতালোভ, বাতুলতা ছেড়ে সঠিক তথ্যে এসো। আর "প্রগতিশীল মহল্" হলো তো তোমাদের মতে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা আর তাদের পদলেহী কুকুরগুলো [সেভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহী কুকুরগুলোও]—তাদের কাছ থেকে সভ্যরাষ্ট্র হিসাবে সার্টিফিকেট নিতে চীনের মহান জনগণ ঘৃণা বোধ করেন।

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ, সেভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের পদলেহী কুকুরেরা চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অগ্রবর্ত্তীবাহিনী 'রেডগার্ড'দের

(লালরক্ষী) সম্বন্ধে কুৎসা রটনায় পঞ্চমুখ। প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে এই রেডগার্ড কারা এবং রেডগার্ড-দের সঙ্গে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সম্পর্কই বা কি ?

এই রেডগার্ড বাহিনী তৈরী হয়েছে সকলস্তরের ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকদের নিয়ে।

এই রেডগার্ড বাহিনী কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও একটি স্বতন্ত্র সংগঠন হিসাবে কাজ করে থাকে। কাজটি হচ্ছে এই—চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি যেন সংশোধনবাদের আস্তাকুঁড়ে না পড়ে। মহান লেনিন বলেছেন, পার্টিকে পার্টি বি-রোধীদের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হোলে পার্টির বাইরের কর্মীদের অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধান্তগুলির সাহায্য নিতে হয়।

সুতরাং 'রেডগার্ড' বাহিনীর সম্পর্কে যারা কুৎসা রটনা করে, তারা আসলে 'লেনিন'-কেই বিকৃত করে।

প্রতিবিপ্লবীরা আর্তনাদ করছে চীনে নাকি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে পুরানো সমস্ত কিছু সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা হচ্ছে। সত্যিই কি তাই ? এই প্রতি-বিপ্লবীদের অপপ্রচারটি ধরা পড়ে যখন সভাপতি মাও-এর ১৯৪২ সালে ইয়েনান ফোরামের ভাষণটি মনে পড়ে—"চীনের এবং বিদেশের বিগত কালের শিল্প সাহিত্যের অপূর্ব ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নেব আমরা, আমরাই তার বৈধ অধিকারী।" এই প্রসঙ্গে জানিয়ে দিই যে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবে অংশগ্রহণকারীদের জন্য সভাপতি মাও-এর "শিল্প ও সাহিত্যের ওপর ইয়েনান আলোচনা সভায় বক্তৃতা মালা" (Talks at the Yenan forum on Literature and Art), "জনসাধারণের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের মোকাবেলা করা" (On correct handling of contradictions among the people) ইত্যাদি অবশ্য পাঠ্য হিসাবে স্থির করা হয়েছে।

সুতরাং প্রতিবিপ্লবী প্রচার যে অপপ্রচার সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

সোভিয়েত রাশিয়ার সংশোধনবাদী নেতৃবৃন্দ 'মরাকান্না' শুরু করে দিয়েছে—চীনে নাকি 'মার্ক্সীয় সাহিত্য' দ্রুত অগ্নিগর্ভে স্থান পাচ্ছে।

দয়া করে সোভিয়েত সংশোধনবাদীরা সেই সব বইগুলির নামের একটা প্রামাণ্য তালিকা তাদের পত্র পত্রিকার মারফত প্রকাশ করবেন কি ?

আজকে সোভিয়েত রাশিয়ার এই 'মরাকান্না' তার প্রতিবিপ্লবী আর্তনাদ। এই আর্তনাদ চাপা পড়ে গেছে আজ বিশ্বের প্রতিটি মুক্তিকামী মানুষের বিপ্লবী অভিনন্দনে।

ভারতের 'বিপ্লবের একমাত্র ইজারাদার' নয়া সংশোধনবাদীরা (যারা প্রতিদিন বলে আগামীকাল বিপ্লব করবে) বলেছে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি নাকি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুত। এ উক্তিটি তারা করেছে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির সহ-সভাপতি লিন পিআও-এর ঐতিহাসিক রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে। নবম কংগ্রেসের জয়—সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জয়। সুতরাং নবম কংগ্রেসের রিপোর্টের বিরোধিতা করার অর্থই হচ্ছে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিরোধিতা করা। আর সেই কারণেই নয়া সংশোধনবাদীরা সর্বহারার মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিরোধিতা করেছে। এ বিরোধিতার মধ্যে তাদের প্রতিবিপ্লবী আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে।

০ ০ ০ ০ ০ ০

সর্বহারার মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যার সূচনা ও পরিচালনা করেছেন সভাপতি মাও নিজে, সেই বিপ্লব আজ সারাবিশ্বের বিপ্লবী জনতার অভিনন্দনে পুষ্ট হয়ে এগিয়ে চলেছে। সেই বিজয় রথের চাকার তলায় চাপা পড়ে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, ভারতের সংশোধনবাদী নয়াসংশোধনবাদী চক্র (শুধু সাইন বোর্ডের তফাৎ) এবং বিভিন্ন দেশে তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা আর্তনাদ করে চলেছে। তারা বলছে তারা নাকি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কে রক্ষা করছে। হ্যাঁ সত্যিই তারা রক্ষা করছে — যদি মার্কস ও লেনিনকে বাদ দিতে হয়।

"প্রতিটি প্রতিক্রিয়াশীল বস্তুই এক, তাকে আঘাত না করলে সে পড়বে না। এটা যেন ঝাড়ু দেবার মতো, ঝাড়ু না দিলে ধুলোও নিজে থেকে সরে যাবে না।"

—মাও সেতুঙ্

রাষ্ট্রের জন্ম

অমিত কুমার ঘোষ
দ্বিতীয় বর্ষ, রাশি বিজ্ঞান

ডারউইনের জীববিদ্যা অনুসারে আজকের মানুষ একদিনে হঠাৎ জন্মায় নি। তার মূল খুঁজতে আমাদের ফিরে যেতে হবে লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার এককোষী সামুদ্রিক প্রাণীর যুগে, যা থেকে যুগ যুগ ধরে বহু জটিল পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আজকের মানুষের জন্ম হয়েছে। তেমনি আজকের রাষ্ট্রের জন্মের ইতিহাস জানতে হলে ফিরে যেতে হবে সেই মান্ধাতার আমলে, তারপর দেখতে হবে তখনকার সমাজ পরিবার, রীতিনীতি ইত্যাদি ছিল কি রকম, কি ভাবেই বা তার বিকাশ ঘটেছে বিভিন্ন যুগে আর তার থেকে কি ভাবে জন্ম নিয়েছে রাষ্ট্র।

প্রসিদ্ধ জার্ম্মান সমাজতত্ত্ববিদ্ ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স মানবসমাজের ক্রম-বিকাশের এই ইতিহাসকে তিনটি প্রধান স্তরে ভাগ করেছেন তাঁর 'Origin of the family, private property and state' নামক গ্রন্থে। এর প্রথমটি Savage বা প্রাকৃতিক যুগ, দ্বিতীয়টি হলো Barbar বা গোড়াপত্তনের যুগ এবং সব শেষেরটি হলো Civilisation বা উৎকর্ষের যুগ।

'স্যাভেজ' বা প্রাকৃতিক যুগে মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বনে জঙ্গলে, নদী বা সমুদ্রের ধারে ধারে ফলমূল ও শিকারের খোঁজে ঘুরে বেড়াত। শিকারের এবং সংগ্রহের ফলে তারা যা কিছু পেত তা সবাই দলের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করে নিত। আহার সংগ্রহ ও ভোগ সবই ছিল যৌথ এবং সহজ সাম্য ছিল পুরো-মাত্রায়। নারী ও পুরুষের কাজে এ সময়েই ভেদ দেখা দেয়। দলের সমস্ত পুরুষ করত শিকার এবং ফলমূল সংগ্রহ আর দলের সমস্ত নারীরা ছিল রান্নাবাড়া ও

অন্যান্য গৃহস্থালী কাজের ভারে। মানুষের ইতিহাসে এটাই সর্বপ্রথম শ্রমের শ্রেণী-বিভাগ। তবুও তখন পর্যন্ত সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন অসাম্য উপস্থিত হয়নি। তার কারণ নারী ও পুরুষের তখনও কোন সম্পত্তি বা বিশেষ এক্তিয়ার তৈরী হয় নি। কেবলমাত্র পুরুষ ছিল বাহিরের রাজা আর নারী ছিল ঘরের রাণী। আর দ্বিতীয় কারণ হলো তখন আজকালকার মতো কোন পরিবার ছিল না। একটা দলের সমস্ত পুরুষ দলের সমস্ত নারীর স্বামী বলে বিবেচিত হতো। এর নাম দলগত বিবাহ বা Group marriage.

কিছু কাল পরে মানুষ বিচরণের যুগ ছেড়ে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তুলল আর দলকে করে তুলল আরো শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ। এই সময়েই মানুষের সমাজে প্রথম দেখা দিল গোষ্ঠী—এঙ্গেল্‌স্‌ যেটাকে বলেছেন Gens. এই গোষ্ঠী প্রথায় একদল নরনারী, যাদের উৎপত্তি কোন এক আদিম নারী থেকে, তারা এক সঙ্গে বসবাস করতে আরম্ভ করলো। এই গোষ্ঠী ব্যবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখবার জন্য একই গোষ্ঠীর ভিতর বিবাহ নিষিদ্ধ করা হলো, নিষিদ্ধ করা হলো পিতা-কন্যা, মাতা-পুত্র ও ভাই-বোনে বিবাহ, যেটা আজকের যুগে কল্পনাতীত ও গর্হিত মনে হলেও মান্ধাতার অমালের 'স্যাভেজ্‌' যুগে চলতি ছিল। কোন এক গোষ্ঠীর নারীদের বিবাহের জন্য অন্যকোন গোষ্ঠী থেকে পুরুষ আনতে হতো এবং তাদের সন্তান সন্ততিরা হতো মা-এর গোষ্ঠীর লোক। অর্থাৎ বংশ পরিচয় ছিল মায়ের নামে। এই ধরণের গোষ্ঠীকে বলে 'মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠী'। এই সব নতুন প্রথার ফলে বিবাহের রূপও গেল পাল্‌টে। নতুন যে বিবাহ পদ্ধতি দেখা দিল তাতে যে কোন দুজন নরনারী একত্রে ঘর করতে পারত। আবার প্রয়োজন হলে বা সহবাসে অনিচ্ছা দেখা দিলে তাদের যে কোন একজন আর একজনকে ছেড়ে আবার অন্য কারো সঙ্গে ঘর করতে পারতো। অর্থাৎ উভয়ের দিক থেকেই কোন রকম বাঁধা-বাঁধি ছিল না। এই ধরণের বিবাহকে বলা হয় জোড়-বিবাহ বা Pairing marriage. এই ক্ষণভঙ্গুর বিবাহ প্রথা তখনকার যৌথ গোষ্ঠীনীতির সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে যেত আর্থিক কিংবা সন্তানের পরিচয় দেওয়ার দিক থেকে। সেই জন্যই এই প্রথার উদ্ভব তখন হয়েছিল।

বিরাট যৌথ বস্তীতে জোড়-পরিবারগুলো তখন বাস করতো। গোষ্ঠীর সকল পুরুষ শিকার ও সংগ্রহ করে যা পেত তা গোষ্ঠীতে যৌথভাবে মেয়েরা

রাঁধতো ও পরে সকলে সমান ভাগে ভাগ করে নিত। সংসারের অর্থাৎ গোষ্ঠীর পরিচালনা-ভার থাকত কোন প্রবীণা নারীর হাতে। তিনি হলেন গোষ্ঠী মাতা। অর্থাৎ এযুগে নারীর প্রাধান্যই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্ত্তী 'বাব্বার' বা গোড়াপত্তনের যুগে এসে মানুষ পশুপালন ও কৃষি কার্য শিখল। মানুষের আর্থিক ও সামাজিক ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এ একটা বিপুল বিপ্লব। এইসময়ে চাষবাস করা হতো যৌথভাবে সেই যায়গায়, সেখানে গোষ্ঠীর লোকেরা বসবাস করতো। এই অঞ্চলটাকে গোষ্ঠীর সম্পত্তি বিবেচনা করা হত। গোষ্ঠীর সমস্ত পুরুষ গোষ্ঠীর যৌথ জমিতে একত্রে চাষবাস ও পশুপালন করতো এবং এ দুই ভাবে উৎপন্ন দ্রব্যই পরে একসঙ্গে সমান ভাবে সবাই ভোগ করতো। কিন্তু পরে ক্রমশঃ চাষবাসের উন্নতি ও ব্যাপক বিকাশের ফলে এই পদ্ধতি আর বজায় রাখা সম্ভব হলো না। তখন বিভিন্ন পরিবারকে গোষ্ঠী থেকে লটারী করে জমি বিলি করে দেওয়া হতো চাষবাস করে পরিবারের ভরণ পোষণের জন্যে। প্রথম প্রথম জমি গুলো দেওয়া হতো সাময়িকভাবে চাষবাসের জন্যে এবং চাষের পরে গোষ্ঠীর লোকেরা আবার সমবেত ভাবে তাতে পশু চরাতো। অর্থাৎ জমিতে কোন ব্যাক্তিগত বা পরিবারগত মালিকানা থাকতো না ; থাকতো শুধু ভোগস্বত্বের অধিকার। এই সময় যৌথ বস্তী থেকে জোড়-পরিবারগুলো পৃথক হয়ে পড়তে থাকে এবং যে বাড়ীগুলোতে তারা বসবাস করতো সেগুলো তাদেরই সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হতো। জমি কিন্তু তখনও গোষ্ঠীরই এবং সামাজিক ও আর্থিক সমস্ত রকম কার্যই গোষ্ঠীগতরূপে হতো। অর্থাৎ এছাড়া কেবল পোশাক পরিচ্ছদ ও গৃহস্থালী বাসনপত্র ছাড়া মানুষের আর কোন রকম সম্পত্তি ছিলনা। পরিবার-গুলোকে কেবলমাত্র ভোগস্বত্বের কড়ারে দেওয়া এই জমিগুলোই পরবর্ত্তীকালে ক্রমশঃ পরিবারের তাঁবে চলে আসে এবং তাদের গোষ্ঠীগত রূপ উঠে গিয়ে তা ব্যক্তি বা পরিবারগত হয়ে পড়ে।

এদিকে আবার পশুপালনের ফলে গোষ্ঠীতে প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদিত হতে লাগল, আর এতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করল পুরুষ। গৃহস্থালী কার্যের চেয়ে বাইরের এই কাজটা মুখ্য হয়ে ওঠায় সমাজে নারীর প্রাধান্য কমে গিয়ে পুরুষ প্রাধান্যের সূত্রপাত হলো। পরে কৃষিকার্য আবিষ্কার হলে পর প্রথম প্রথম জমিতে নারীরাই খাটতো। আবার ঘরের কাজও তাদেরই করতে হতো

কিন্তু পরে কৃষি ব্যাপকভাবে বেড়ে যেতে থাকায় পুরুষের হাতেই চাষের কাজ চলে আসে এবং নারীরা ঢোকে গিয়ে ঘরের ভিতর। 'বার্বার' যুগের শেষের দিকে অর্থাৎ 'Civilisation' বা উৎকর্ষের যুগের প্রাক্কালে পরিবারের তাঁবে যখন প্রচুর জমিজমা ইত্যাদি সম্পত্তি দেখা দেয় তখন পুরুষ নিজের স্বার্থে জোড়-পরিবার প্রথা তুলে দেয় ও জনক-বিধির পত্তন করে। কারণ পূর্বে প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতিতে সন্তানের মা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা থাকলেও তার পিতা কে তা নিশ্চয় করে বলা বা জানা যেত না। ফলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে গণ্ডগোলে পড়তে হতো। তাছাড়া তখনকার মাতৃতন্ত্রে সম্পত্তি স্বামী বা সন্তানের গোষ্ঠীতে না থেকে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী মাতার মৃত্যুর পর মাতার গোষ্ঠীতে চলে যেত, ফলে পুরুষদের বঞ্চিত হতে হতো। নতুন যে বিবাহ পদ্ধতি দেখা গেল তাতে কেবলমাত্র একজন পুরুষ ও একজন নারী স্থায়ী ও অচ্ছেদ্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো। এই বিবাহ পদ্ধতির নাম এক পতি-পত্নীত্বমূলক বিবাহ বা Monogamy. বিবাহ ও পরিবার প্রথাটার দীর্ঘ আলোচনা করার কারণ হলো এর সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিকাশের ঘনিষ্ট যোগ রয়েছে। এ সম্বন্ধে জার্ম্মাণ সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস বলছেন—"Family contains within itself in miniature all the antagonisms which later develop on a wide scale within society and its state".

এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে গোষ্ঠীর আইনকানুন, শাসন-পদ্ধতি বা পরিচালনাটা কিরকম ছিল?

গোষ্ঠীর সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নরনারী ভোট দিয়ে একজন গোষ্ঠীনেতা ও একজন 'সমর নায়ক' নির্ব্বাচন করতো এবং গোষ্ঠীর একটি সার্ব্বজনীন সভা ছিল যাতে সকলে উপস্থিত থেকে সমবেতভাবে আলোচনা করে কার্যনীতি নির্ধারণ করত। এবিষয়ে সবার ছিল সমান অধিকার। গোষ্ঠীনেতা গোষ্ঠীর সমগ্র ভালো মন্দ নিয়ে মাথা ঘামাতে বাধ্য থাকতেন। তিনি ছিলেন একাধারে গোষ্ঠীর প্রতিনিধি ও পুরোহিত। 'সমর-নায়ক' কেবলমাত্র লড়াইয়ের সময় গোষ্ঠীর সমস্ত অধিবাসীদের নেতৃত্ব দিতো। তবুও এ দুজনের বিশেষ কোন অধিকার থাকতো না। গোষ্ঠীর আর সকল লোকের মতনই ছিল তাদের অধিকার এবং কোন বিশেষ সম্পত্তির অধিকারীও তারা ছিল না। গোষ্ঠীর লোকেরা যখন খুশী তখনই এদেরকে বরখাস্ত করতে পারতো। অর্থাৎ তারা ছিল গোষ্ঠীরই একজন, গোষ্ঠীর ওপরে নয়। গোষ্ঠীর মধ্যে কোন

বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দিলে সাব্বর্জনিক সভায় সবাই মিলে তার একটা মিটমাট করে ফেলত। একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে যে সে যুগে মানুষের মিথ্যা কথা বলা স্বভাব ছিল না এবং চুরির ধারণাও তখন ছিল না ; কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কোন পদার্থ তখনো দেখা দেয়নি। এসব পরবর্ত্তী 'উৎকর্ষ' বা 'Civilisaion'-এর যুগে দেখা দিয়েছে যখন সম্পত্তি সম্বন্ধে মানুষ 'আমার তোমার' জ্ঞানটা বেশ ভালো ভাবে হজম করে ফেলেছে।

এই রকম কয়েকটি পরস্পর রক্তসম্বন্ধ-যুক্ত গোষ্ঠী সুবিধার জন্য পরস্পর সঙ্ঘবদ্ধ হতো এবং গঠিত হতো 'ফ্যাট্রী'। আবার কতকগুলো ফ্যাট্রী নিয়ে তৈরী হত একটা 'ট্রাইব' বা ক্ল্যান জাতি। রক্ত ও ভাষার ঐক্যই এই গোষ্ঠীগুলোকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে বিশেষ সাহায্য করতো। 'ফ্যাট্রী'র একটি নিজস্ব সভা থাকতে যাতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা বসতে পারতো আবার এই ফ্যাট্রী থেকেও অনুরূপভাবে প্রতিনিধি নিয়ে তৈরী হতো ট্রাইবের নিজস্বসভা বা জাতীয় সভা। এই সভার আলোচনায় গোষ্ঠীগুলোর সবাই যোগ দিতে পারত যদিও নীতি নির্ধারণের ভার থাকত প্রতিনিধিদের হাতে। অবশ্য এই সমস্ত প্রতিনিধিদের সরাসরি যখন ইচ্ছে বরখাস্ত করতে পারতো গোষ্ঠীর লোকেরা। বিভিন্ন অন্তর্গোষ্ঠীয় ঝগড়া-ঝাঁটি ও সামাজিক লেনদেন বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করত এই সভা। কিন্তু প্রত্যেকটি গোষ্ঠীই ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধীন।

সুতরাং এ পর্যন্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে তখনকার শাসন পদ্ধতি ও নিয়মকানুন ছিল যথেষ্ট নিখুঁত ও ন্যায়সঙ্গত। সমাজের সর্ব্বত্রই ছিল সাম্য। উপরন্তু আরো দেখা যাচ্ছে যে শাসন প্রতিষ্ঠান সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন বা সমাজের উপরে অবস্থিত দণ্ডমুণ্ডের অধিকারী কোন প্রতিষ্ঠান নয়। এবং এই শাসনভার কোন মুষ্টিমেয় লোকের হাতের মুঠোয় চলে গিয়ে কিছু লোকের স্বার্থে পরিচালিত না হয়ে সমাজের স্বার্থে, সকলের স্বার্থে পরিচালিত হত। সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা কিংবা বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশরক্ষার জন্য কোন বিশেষ সৈন্যবাহিনী বা ফৌজও ছিলনা। কারণ প্রয়োজন হলে সকলেই একসঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বহিঃ-শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করত।

কিন্তু এই পদ্ধতিটাকে কি বর্ত্তমান অর্থে ব্যবহৃত 'রাষ্ট্র' বলা যায় ?—না। কারণ বর্ত্তমানে ব্যবহৃত রাষ্ট্রের স্বরূপ ও অর্থ আলাদা। এঙ্গেল্‌স্-এর ভাষায়,

"The power, arisen out of society but placing itself above it, and alienating itself more and more from it, is the state."

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আধুনিক কালের রাষ্ট্র নামক বস্তুটা সাবেক কালে ছিল না; অথচ এটা সেই সমাজ থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। তা হলেই প্রশ্ন ওঠে, প্রাচীন সমাজ থেকে কি করে এবং কেন এই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলো? সেটা জান্‌তে হলে পৃথিবীর অতীত ইতিহাসটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার।

উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠী সমাজে প্রচুর ধনসমাগম হতে থাকে। আবার অন্য দিকে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য গোষ্ঠীর সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দেয়। এসব কারণে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে লড়াই ছিল 'বার্ব্বার' যুগের শেষ ধাপের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। ফলে সমাজে স্বাভাবিক শান্তির আবহাওয়া নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দেশরক্ষার জন্য একজন করে সমর-নায়ক (এরাই গ্রীসে বাসিলিউস, রোমে রেক্‌স্‌ ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল) নিযুক্ত করা হতো।

দেশে শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার জন্য আইনকানুন প্রয়োগের সমস্ত ভার আস্তে আস্তে এই সমস্ত সমর-নায়কদের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। এবং এদের চার পাশে দেখা দিতে থাকে যোদ্ধা সাঙ্গপাঙ্গরা। এই সমস্ত সমর-নায়করা ঠিক স্বাধীন নয় এবং গোষ্ঠীর লোক কর্তৃক তারা বিভিন্ন পরিবার থেকে যোগ্যতা ও গুণ অনুযায়ী নির্বাচিত হতো। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই নীতি উঠে যায়। নায়ক নির্বাচন তখন একটা বিশেষ পরিবারেরই একচেটিয়া হয়ে যায়। এবং এই ভাবেই পরবর্ত্তী কালে রাজতন্ত্র ও কৌলীন্য প্রথার সৃষ্ট হতে থাকে এবং সমাজে তারা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে বসে। এদের সমাজ রক্ষার কাজের বিনিময়ে কিছু জমিজমা অতিরিক্ত দেওয়া হত এবং জনসাধারণ তার জন্যে গতরে খেটে কিছু কিছু উপকারও করতো। কিন্তু তবুও সেই সমস্ত নায়কদের গোষ্ঠীর যৌথ সম্পত্তির প্রথা মেনে চল্‌তে বাধ্য করা হত এবং জমিজমা ছিল পরিবারের অধিকারে আর যৌথ বনভূমিতে পশুচারণের অধিকার ছিল সকলের সমান। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই সমস্ত নায়কেরা গায়ের জোরে সাঙ্গোপাঙ্গদের সাহায্যে লুটপাট্‌ করে এবং নানা রকম আইনের মারপ্যাঁচে যৌথ জমিগুলো হস্তগত করতে থাকে এবং গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের স্বেচ্ছায় খেটে দেওয়ার প্রথাকে বাধ্যতামূলক বেগার খাটুনিতে পরিণত করে ফেলে। এবং জমিজমার উপর কর দাবী করে বসে; কারণ ক্ষমতার মোহে উন্মত্ত হয়ে তারা তখন নিজেদেরকে সমস্ত

জমিজমা ইত্যাদির মালিক ঠাওরে বসেছিল। আর এ ভাবেই সমাজে সৃষ্টি হয় জমিদারী ও রায়ত প্রথা। পোল্ লার্ফাগ তাই তাঁর "Evolution of private property" গ্রন্থে বলছেন—"আসল কথা জমিদার (Feudal lord) দের জমিজমা সবই জুয়াচুরি এবং লুট্‌পাট্ ও ডাকাতির ফলে গড়ে উঠেছিল। জমিদারেরা প্রথম প্রথম ব্যক্তিগত নিজস্ব ভোগ করত না। সে যুগের যৌথ নীতি আস্তে আস্তে ছলে বলে, কৌশলে তুলে দেওয়াই জমিদারবাবুদের কীর্ত্তি। খাঁটি প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় হাত দিলে তাঁদের সে সমস্ত কারচুপি ধরা পড়বে।"

কোন কোন জায়গায় আবার জমিদারি প্রথা এসেছে একটু অন্য ভাবে। যেমন, এক দেশ আর এক দেশকে জয় করার পর বিজিত দেশের হাতে শাসন ভার এসে পড়ে। অথচ বিজিত দেশের গোষ্ঠীপ্রথা তাদের নিজস্ব গোষ্ঠী প্রথার সঙ্গে মেলে না। ফলে সেই দেশের গোষ্ঠী-শাসনকে টিঁকিয়ে রাখা আর সম্ভব নয়; তার জায়গায় বিজেতা জাতি কর্ত্তৃক নির্বাচিত সামরিক প্রতিনিধিরাই বিভিন্ন গোষ্ঠী অঞ্চলের সমস্ত রকমের শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়। কালক্রমে তারাই ঐ অঞ্চলের এক এক জন করে স্বাধীন সামন্তে পরিণত হতে থাকে। এই গেল সামন্ত প্রথার উৎপত্তির ইতিহাস।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে গোষ্ঠীর মধ্যেই শ্রেণীভেদ এবং ধন সম্পদে অসাম্য দেখা দিয়েছে এবং গোষ্ঠী প্রথার ভাঙন শুরু হয়ে গেছে।

অন্য দিকে আবার সমাজে প্রয়োজনের তাগিদে ক্রমশ শিল্প বিস্তৃত হতে থাকে। পূর্বের শিল্পকর্মের গোষ্ঠীগত সরল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ উঠে যায় এবং জটিল ও ব্যাপক আকারে দেখা দিতে থাকে; ফলে সমাজে শ্রম বিভাগ একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং সমাজে নানারকম শ্রেণী গড়ে উঠতে থাকে। এই সময়েই শুরু হয় গোলামী প্রথা, যা মানুষের সভ্যতার উপর অত্যন্ত খারাপ প্রভাব ফেলেছিল। এর ফলেই সমাজে দুটো শ্রেণী দেখা দেয়, একদল কেবল খেটে মরতে থাকে, কোন ফলই ভোগ করতে পায় না। আর অপরদল তাদের পরিশ্রমের ফল বিনা পরিশ্রমে আত্মসাৎ করতে থাকে—এই শ্রেণীর লোকেরা হলো মালিক শ্রেণী।

এই সময়ে সমাজে উৎপন্ন দ্রব্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে যাওয়ায় অন্যান্য সমাজের সঙ্গে বিনিময় প্রথার সৃষ্টি হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমশ বিস্তৃত

হতে থাকে এবং এ সমস্ত কাজগুলো এক শ্রেণীর লোকের একচেটে হয়ে পড়ে এবং স্বতাবতঃই এদের হাতে প্রচুর ধনসম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে থাকে।

এই ভাবে সমাজে নানা শ্রেণীর মানুষের সৃষ্টি হতে লাগলো এবং তাদের আর্থিক স্বার্থে ও সামাজিক অধিকার নিয়ে নানা বিরোধ উপস্থিত হলো। সুতরাং এই নতুন পরিস্থিতিতে পুরানো গোষ্ঠী প্রথা অচল হয়ে পড়তে থাকে এবং প্রয়োজন দেখা দেয় এমন একটা শাসন-কেন্দ্র যা এই সমস্ত বিরোধ গুলোকে মানিয়ে নিয়ে সমাজকে রক্ষা করতে পারে। আর এই নতুন কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠানই হলো 'রাষ্ট্র'। কিন্তু যেহেতু সে সময়ে আর্থিক দিক দিয়ে অগ্রগামী শ্রেণীই সমাজের চূড়ায় অবস্থিত ছিল, সুতরাং রাষ্ট্র হলো এদেরই হাতের যন্ত্রস্বরূপ এবং এদের স্বার্থকে টিঁকিয়ে রেখে অন্যান্য শ্রেণীকে বঞ্চিত ও শোষণ করাই এই নতুন শাসন প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে উঠলো। ফলে সৃষ্টি হলো বাছা বাছা লোক নিয়ে তৈরী সৈন্যবাহিনী এবং রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার জন্য নানা রকম করের বোঝা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে গোষ্ঠীর মধ্যেই উৎপন্ন হয় বিভিন্ন শ্রেণীর দ্বন্দ্ব এবং তারফলেই গোষ্ঠীর সাম্য নীতি ভেঙ্গে গিয়ে গোষ্ঠীরই সমাধির উপর মাথা তুলে দাঁড়ায় রাষ্ট্রের সৌধ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রবেশ করে উৎকর্ষের যুগে। মুদ্রা, বণিক, নিজস্ব ও গোলামী এই চারটি জিনিষ হলো এযুগের আর্থিক ভিত্তি। আর সামাজিক ভিত্তি হলো এক পত্নী-পতিত্ব মূলক পরিবার ও নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য। এরকম ধন-জন সমন্বিত সমাজের শাসন কেন্দ্র হলো রাষ্ট্র।

রাষ্ট্রের উৎপত্তির এই ধারাটা আবিষ্কার ও প্রমাণ করার জন্য এঙ্গেল্‌স্ তাঁর 'Origin of the family, private property and state' নামক গ্রন্থে প্রাচীন এথেন্স, রোম, কেল্টিক, জার্ম্মাণ প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের বহু প্রাচীন ঐতিহাসিকের প্রামাণ্য রচনা, সেখানকার গোষ্ঠী-প্রথা, তার ভাঙন, নতুন নতুন আইন-সংহিতা, সংবিধান ও শাসনব্যবস্থার সুদীর্ঘ তথ্যপূর্ণ ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন। তার থেকে আমরা জানতে পারি এথেন্সে গোলামের সংখ্যা ছিল অভিজাত ধনীদের সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশী। এদের ও অন্যান্য নির্ধন সম্প্রদায়গুলোর সঙ্গে অভিজাত সমাজের দ্বন্দ্বের ফলে গোষ্ঠীনীতি লোপ পায় এবং তার স্থলে জগতে

প্রথম দেখা দেয় রাষ্ট্র। রোমে প্যাট্রিসিয়ান নামক অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে প্লেব্‌স্‌ নামক নির্ধন জনসাধারণ ও বিরাট গোলামশ্রেণীর সংঘর্ষ জন্ম দেয় রাষ্ট্রের। অপর দিকে জার্ম্মাণরা প্রায় সমগ্র ইওরোপব্যাপী বিশাল রোম সাম্রাজ্য দখল করার ফলে বিজিত দেশগুলোতে শাসন ব্যবস্থা চালাবার জন্য সেখানকার সাম্যবাদী গোষ্ঠীশাসনকে উচ্ছেদ করে তার জায়গায় প্রবর্ত্তন করে রাষ্ট্র শাসন।

এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলোর স্বরূপ আলোচনা করলে দেখা যায় বিশেষ একশ্রেণীর লোকের সুবিধা করে দেওয়াটাই হলো রাষ্ট্রের কাজ। প্রাচীণ কালের ইউরোপে রাষ্ট্র গোলামদেরকে দাবিয়ে রেখে তাদের মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থকে রক্ষা করার যন্ত্র স্বরূপ। মধ্যযুগের ইওরোপে ও অন্যত্র শাসন ক্ষমতা ছিল তাদেরই হাতে যারা বিরাট বিরাট জমিদারীর মালিক এবং রাষ্ট্রের কাজ হলো প্রজা বা রায়তদের শোষণ ও অত্যাচার করা আর ঐ সমস্ত জমিদারগোষ্ঠীর বা ঐ গোষ্ঠীর নায়ক রাজা ইত্যাদির জমিদারি ও সম্পত্তি রক্ষা করা। 'উৎকর্ষের' যুগে যে তথাকথিত প্রতিনিধিতন্ত্রের উদ্ভব হয় তাতেও দেখা যায় অর্থ ও প্রতিপত্তি যাদের যত বেশী প্রতিনিধিত্ব করে তারাই অর্থাৎ রাষ্ট্র সকলের স্বার্থে পরিচালিত না হয়ে, কেবলমাত্র তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের হাতের যন্ত্র বিশেষ।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এঙ্গেল্‌স্‌ তাই বলেছেন—

"State is a product of society at a certain stage of development; it is the admission that this society has become entangled in an insoluble contradiction with itself, that it has split into irreconcilable antagonisms which it is powerless to dispel. But in order that these antagonisms and classes with conflicting economic interests might not consume themselves and society in fruitless struggle, it becomes necessary to have a power seemingly standing above society that would alleviate the conflict and keep it within the bounds of order; and this power arisen out of society but placing itself above it, and alienating itself more and more from it, is the state."

যাত্রাপথে

অম্লানকুসুম সেনগুপ্ত
দ্বিতীয় বর্ষ, ভূবিদ্যা

মধ্যদিনের রক্তসূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে হেলে পড়ল। বিদায় নেওয়ার আগে বুঝি মুঠো মুঠো অস্ত-আবীরে ও রাঙিয়ে দিতে চায় এই মাটির পৃথিবীটাকে। উঁচু বাড়ীগুলো আর গাছের মাথায় জড়িয়ে রয়েছে তারই পরশ। লালে লাল কোলকাতা।

দূরে বড় রাস্তার মোড়ে পুলিশভ্যানটা বোধ হয় এখনও জ্বলছে। তিনটে আধপোড়া ট্রামের কঙ্কাল আর বিধ্বস্ত কারখানা—অফিসটা সর্ব্বাঙ্গে রণক্ষেত্রের চিহ্ন বহন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রেতের মত। বাতাস গুলিবারুদের গন্ধে ভারী, টিয়ারগ্যাসের জ্বালায় চোখ মেলা দায়। ক্ষণে ক্ষণে পুলিসের বাঁশির আওয়াজ আর ভীত মানুষের উন্মত্ত ছোটাছুটি। ওখানেই একটু আগে মৃত্যুঞ্জয় নামে একটি তাজা প্রাণ পথের ধুলিতে লুটিয়ে পড়েছে, দেহটা থেঁতলে গেছে পুলিশের বুটের তলায়।

অনির্বাণ আর পারে না। মিছিলের উপর পুলিশ আর মালিকের গুণ্ডাবাহিনীর যুগপৎ আক্রমণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেছিল। অন্যান্য কমরেডরা যখন রাস্তায় ব্যারিকেড নির্মাণে ব্যস্ত, বেঁটে শীর্ণকায় মৃত্যুঞ্জয়ও হাতের কাছে যা পেল তা নিয়েই ছুটে গেল পুলিশের দিকে, তখন ও স্থানুর মত দাঁড়িয়েছিল। তারপর গুলি খেয়ে মৃত্যুঞ্জয় পড়ে যেতেই ওর হুঁশ হল। দৌড়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, কার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল।

বাতাসে ভেসে এল মৃত্যুঞ্জয়ের অন্তিম আর্তনাদ—আঃ—। ওর দু চোখের ওপর দিয়ে যেন একটা কালো ঢেউ খেলে গেল। প্রাণপণে ও ছুটে পালাতে চাইল ঐ বীভৎস দৃশ্যের সামনে থেকে। "অনির্বাণ তুমি এত ভীরু! তুমি কাপুরুষ!" মনের মধ্যে কে যেন গুজরে উঠল। কিন্তু তখনই চোখের সামনে ভেসে উঠল মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু-আকীর্ণ মুখ, পুলিশ আর গুণ্ডাবাহিনীর চক্ষে হত্যালালসা। "আমি পারব না, আমি পালাতে চাই। এই বীভৎস নির্মম আঘাতের সম্মুখে লালপতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে এগিয়ে যেতে আমি কিছুতেই পারব না।" আপন মনেই বলল ও।

পার্কের বেঞ্চিটার ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল ও। নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। আঃ—পৃথিবী এখানে শান্ত, অচঞ্চল। পৈত্রিক প্রাণটাকে, বাইরের লোকের কাছে হয়ত যার কোন মূল্য নেই, কিন্তু ওর মা-ভাই-বোনের কাছে তার দাম অনেক, তাকে সে অবশেষে বাঁচাতে পেরেছে। গভীর আরামে অনির্বাণ চোখ বুঁজল।

অথচ আজ সকালে ওরা চরকির মত ঘুরেছে—ধর্মঘট সফল করার জন্য। কারখানার গেটে, এক ওয়ার্কশপ থেকে অন্য ওয়ার্কশপে ঘুরে ঘুরে ওরা মজুরদের জড়ো করেছে—মৃত্যুঞ্জয়, অনির্বাণ, মগনলাল, সুরয, মিশির ও আরও অনেকে। আজ তিনমাস ধরে কারখানার একটি শিফটে কাজ বন্ধ, দেড় হাজার মজদুর বেকার। কোম্পানীর নাকি উপযুক্ত Order নেই। অথচ ওরা জানে এই তিনমাসে মাসিক পাঁচহাজার টাকা বেতনে নতুন অফিসার নিয়োগে অর্থের অভাব ঘটেনি, মালিকের ছেলের রোলস্ রয়েস দাবড়ানোও এতটুকু কমেনি। গত শনিবার ওরা তাই কারখানার ম্যানেজারকে ঘেরাও করেছিল—দাবী ছিল অবিলম্বে বেকার মজুরদের কাজে ফিরিয়ে নিতে হবে। ইউনিয়নের বাবুরা মুখ বেঁকিয়েছিল—'জনতার সরকার' গদিতে থাকতে আবার এসব কেন? 'অমুক' মন্ত্রীকে একটা ফোন করলেই যখন সব ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু যাদের পেটের ভাত নিয়ে টান পড়েছে তারা 'জনতার সরকারে'র মাহাত্ম্য বুঝতে পারেনি। ফলে ক্ষেপে উঠেছিল মুখোস-খুলে-পড়া দালালেরা। একজন একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে লম্বাচওড়া একটা বক্তৃতা দিতেও চেষ্টা করেছিল—"এসব হচ্ছে কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র, চীনের দালাল উগ্রপন্থীদের হঠকারিতা!" ফলে ঘটল হাতাহাতি, এক

ফাঁকে ম্যানেজার ঘর ছেড়ে পালাল। পরের দিন প্রেসে হেডলাইনে খবর বেরোল, "দায়িত্বশীল যুবকবৃন্দের বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টায় ঘেরাও হইতে ম্যানেজারের অব্যাহতি" (যে বীরত্ব ওরা কয়েক মাস আগে কলেজ ষ্ট্রীট অঞ্চলে ফলিয়েছিল)। আর তার পরেই তিনশ শ্রমিকের উপর নামল ছাঁটাই-এর নোটিশ, তারই প্রতিবাদে আজকের এই ধর্মঘট।

অনির্বাণ! মনে পড়ে নামের পাশে ছাঁটাই-এর খড়্গ ঝুলতে দেখে মনের কি অবস্থা হয়েছিল? নিমেষের মধ্যে আবছা হয়ে ভেসে উঠেছিল পরপর কতকগুলো নাম—রুগ্‌ণ পিতা, বৃদ্ধা মা, বেকার ভাই আর কিশোরী বোন। এদের সবারই যে সে একমাত্র ভরসাস্থল। তার জন্মের পর প্রতিবেশীরা হেসেছিল—যে বংশের সব আশার দীপই নিবু নিবু, তাদের ছেলের নাম আবার অনির্বাণ কেন? আজ তার চাকরী গেলে যে রুগ্‌ণ পিতার মুখে একটু অষুধও জুটবে না, মার দীর্ঘশ্বাস দীর্ঘতর হবে, ছোট ভাই-বোনের সব সাধ-আহ্লাদ যাবে ফুরিয়ে!

তবে, তবে কি ও গিয়ে ম্যানেজারের পা দুটো জড়িয়ে ধরবে? ভাবতেই মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে। নোটিশ বেরোনোর দিনই তো কয়েকজন গিয়েছিল, গেটের গুর্খা দারোয়ান ঢুকতে দেয়নি, ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তা ছাড়া মৃত্যুঞ্জয়! হঠাৎ বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। মৃত্যুঞ্জয় ছিল তার সবচেয়ে বড় বন্ধু, তারও বেশি—সে তার কমরেড। অসুস্থতার জন্য বাবার যে দিন চাকরী গেল, সংসারের পেছনে দাঁড়াবার মত কেউ ছিল না, অনির্বাণকে তাই পড়া ফেলে কারখানার সামান্য কাজে ঢুকতে হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় সেদিন দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল নিজেদের চিনতে চেষ্টা কর, এ রকম করে কতকাল কাটাবি, এ সমাজ আর বেশিদিন টিকবে না। অনির্ব্বাণ তো এর আগে এ রকম করে কোনদিন ভাবতে শেখেনি। মার্কস, লেনিন, স্তালিন, মাও-ৎসে-তুঙ—দূর থেকে সভয়ে এঁদের প্রণাম জানিয়েছে, বুঝে দেখতে সাহস করেনি। মৃত্যুঞ্জয়ই তার চোখ খুলে দিয়েছিল। বড় আবেগের সঙ্গে ও আবৃত্তি করত—

"বল, দীক্ষা আমার অক্টোবরের ঋক্ মন্ত্রে……
আমি স্তালিনের প্রেমিক হাতের দুর্জয় রাইফেল,
মাও-ৎসে-তুঙ আর হো-চি-মিনের মুক্ত হৃদয়ের কবিতা।"

অনির্বাণের মনে পড়ে ১৯৬৬ সালের খাদ্য-আন্দোলনের রক্তঝরানো দিন গুলোতে ওরা পাশাপাশি হেঁটেছে ; ভিয়েৎনাম দিবসের বিশাল সমাবেশে ওরা জনগণের সংগ্রামী ঐক্যের শপথ নিয়েছে। নকশালবাড়ীর আন্দোলনের পর যেদিন মার্কসবাদের ভাঁওতাধারী একদল নেতার মুখোস খুলে গেল সেদিনও মৃত্যুঞ্জয় পড়ছিল, "শ্রেণী সমাজে বিপ্লব ও বিপ্লবী যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী : বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম : সাম্রাজ্যবাদ ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হোল কাগুজে বাঘ : বস্তু নয় জনগণই যুদ্ধের জয় পরাজয়ের চূড়ান্ত নির্ধারক"।

জনগণ! অনির্বাণের হঠাৎ হাসি পেল। কই যে জনগণের জন্য মৃত্যুঞ্জয় প্রাণ দিল তারা তো বিপ্লবের বদলে হিন্দী সিনেমার লাইনে মারামারিতে ব্যস্ত, বেকার যুবক লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে যৌন আবেদনময়ী নায়িকার দেহভঙ্গিমার দিকে, অন্ধকার গলিতে পাউডার আর রুজ-লিপষ্টিকের প্রলেপে কুৎসিত ব্যাধিকে আড়াল করে ব্যবসা ফেঁদেছে রূপোপজীবিনীরা। তবে.....

কিন্তু বেশীক্ষণ এইভাবে মনকে সান্ত্বনা দেওয়া গেল না। ধীরে ধীরে আর একটা ভাবনা ওর চিন্তাশক্তিকে আচ্ছন্ন করতে লাগল। অনির্বাণ বিশ্বাসঘাতক, সে প্রতারক। যে দেড় হাজার বেকার মজদুর ওর কথায় বিশ্বাস করে ধর্মঘটের পথে পা বাড়িয়েছিল, তাদের বিশ্বাসকে সে মর্যাদা দেয়নি। সংগ্রামী ঐক্যের শপথ নিয়ে সে মৃত্যু পথযাত্রী বন্ধুকে ফেলে পালিয়েছে। জনগণের উপর বিশ্বাস রাখার বদলে তাদের এক পথভ্রষ্ট অংশের দিকে তাকিয়ে নিজের আদর্শবোধকে ফাঁকি দিতে চেয়েছে। বেইমান! অনির্বাণের মনে হোল সারা পৃথিবী ওর দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, ওর বাবা-মা-ভাই-বোন ওর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, "দেখ! এই বিশ্বাসঘাতক নিজের শ্রেণীচেতনাকে ফাঁকি দিয়েছে অন্যকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে, নিজের পরিবারকে ধ্বংসের মুখে টেনে নিয়ে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে।" অনির্বাণ পাগলের মত পায়চারী করতে লাগল, বিড়বিড় করে বলল, "এ আমি চাইনি কমরেড! আমাকে ক্ষমা কর! মৃত্যুঞ্জয়!"

দূরে একটা মিছিল এগিয়ে আসছে না? শ্লোগান উঠছে "কমরেড মৃত্যুঞ্জয়ের হত্যার জবাব নয়—বদলা চাই। শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব জিন্দাবাদ। নকশালবাড়ীর পথই বাঁচার পথ।" অনির্বাণ

পাগলের মত সেদিকে দৌড়ল। ঐ তো সুরয মিশির, কারখানার শ্রমিকেরা, আরও অনেকে। "কমরেড!" অনুনয়ের সুরে ও বলল, এই মুহূর্তে ওর মনে হোল এর চেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য মধুর আহ্বান ও জীবনে শোনে নি, "আমায় ফিরিয়ে নাও কমরেড।"

মিছিল এগিয়ে চলেছে। লাল পতাকাটাকে অনির্বাণ শক্ত হাতে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরল।

"বর্তমানে কৃষক আন্দোলনের উত্থান একটা অত্যন্ত বিরাট সমস্যা। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই····· মধ্য, দক্ষিণ এবং উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে কয়েকশ' মিলিয়ন কৃষক প্রবল ঝড় ও ঘূর্ণিবাত্যার মতো তীব্র গতি ও প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে জেগে উঠবে, কোনো শক্তি, সে যত প্রবলই হোক না কেন, এটাকে চেপে রাখতে পারবে না। যে সব বেড়াজাল তাঁদের বেঁধে রাখে, সে সব কিছুকেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে তাঁরা মুক্তির পথে দ্রুত অগ্রসর হবেন। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী, যুদ্ধবাজ, দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারী, স্থানীয় উৎপীড়ক এবং অসৎ ভদ্রলোককে তাঁরা কবরে পুঁতে রাখবেন। সমস্ত বিপ্লবী পার্টি ও দল এবং সমস্ত বিপ্লবী কমরেডকেই তাঁদের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে— গ্রহণ করা বা বর্জন করা—তাঁদের ইচ্ছা। তাঁদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে তাঁদের নেতৃত্ব করা? না তাঁদের পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁদের ভেংচী কেটে সমালোচনা করা? অথবা তাঁদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের বিরোধিতা করা? এ তিনটির একটাকে বেছে নেবার স্বাধীনতা প্রতিটি···লোকেরই আছে। কিন্তু পরিস্থিতি আপনাকে সত্বরই বেছে নিতে বাধ্য করবে।"

—মাও সেতুঙ

স্বাধীনতা

পথিক গুপ্ত
তৃতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান

॥ এক ॥

ওরা বেরিয়ে এলো।

সদর হাসপাতালের নামাঙ্কিত দরজাটাকে পেছুনে ফেলে পীচ বাঁধানো বড় রাস্তাটায় ওরা এসে দাঁড়াল। ওদের রুগ্নতা ওদের মন্থর গতিতে ধরা পড়ল।

ওরা চারজন। অল্প কিছুদিন আগে আসা 'নবাগত' শিশুটিকে ধরলে ওরা পাঁচজন। পরিবার কর্ত্তার দুহাতে ধরা দুটো ছোট ছেলেমেয়ে, যাদের বয়স শরীরের ক্ষীণতার দরুণ বিচারে ভুল হবে। তবু দু'থেকে আট-এর মধ্যে। ছোট-ছেলেটার গায়ে জামা বলতে কিছুই নেই। প্যাণ্ট বলতে একটা কিছু আছে, যেটা না থাকলেও ক্ষতি ছিলনা কিছু। মেয়েটির ফ্রকটিও যে একটা কাপড়ে তৈরী নয় তা পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাচ্ছিল। যদিও বহুদিনের জমা নোংরা বিভিন্ন রঙের ছিটগুলোকে একটা রূপ দেবার চেষ্টা করছে।

এক কথায় বলতে গেলে আদিম মানব মানবী নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ঢাকার চেষ্টা প্রথমে করেনি। আর আমাদের মহান জন্মভূমির এই দু'জন শিশু যদিও চেষ্টা করেছে কিন্তু সমাজ অনুমতি দেয়নি।

শিশু দুটির বাবাও একটা শতছিন্ন আট হাতি ধুতি দিয়েই পাঁজড়া বার করা বুক আর অন্যান্য প্রত্যঙ্গকে ঢাকার চেষ্টা করছে। কিছুদিন আগে দিগন্তের

মতো স্বপ্ন আর কান্নার মত বাস্তব এই পৃথিবীতে আসা 'নবাগত' টিকে কোলে নিয়ে উদাস দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে আমারই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির এক আদর্শ মা পরনে যাঁর সূতিকাগৃহের শাড়ী যেটাকে পালটে আর একটি শাড়ী পরবার ক্ষমতা যাঁর নেই। আদর্শ মা—ক্ষয়ে যাওয়া জীবনেও যাঁরা নতুনের সুর গেয়ে যান। ভদ্রলোক সপরিবারে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন।

॥ দুই ॥

হাসপতালের সদর দরজাটার সামনে অমূল্যদার চায়ের দোকানটাই আমাদের আড্ডার জায়গা! ঐ জায়গাটাতেই আমরা বাপের হোটেলে খেয়ে গলির নরকে পড়ে আছি।

বেকার জীবনের দুর্বিষহ গ্লানিতে ডুগলেও আমরা নীচে নেমে যেতে পারিনি কয়েকজন প্রগতিশীল বন্ধুর সান্নিধ্যে।

রাজপথে দেখা বিশেষ জিনিষগুলোর কোনটাই আমাদের আলোচনার বাইরে যায় না।

হঠাৎ ভোলা বলে উঠল "ছাখ রন্টি, সাধে কি সরকার জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে বলেছে, নিজের চোখেই ছাখ।" বলেই ভোলা সামনের রাস্তায় বিরাট পরিবার পরিকল্পনার উপদেশ মণ্ডিত সাইন বোর্ডটার তলায় দাঁড়ানো পরিবারটার দিকে আমাদের তাকাতে বলল। কাজেই আমাদের আলোচনার বিষয় বস্তু হয়ে দাঁড়ালো পরিবার পরিকল্পনা সঠিক কি না। আমাদের মধ্যে সত্যসুন্দর আর প্রসূনেরই কিছু পড়াশুনা ছিল। সত্যসুন্দর ম্যালথাস নামক এক পাদ্রীর উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চাইল যে আমাদের মতো অনুন্নত দেশে পরিবার পরিককল্পনা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু প্রসূন অত্যন্ত যুক্তির সঙ্গে বুঝিয়ে দিল যে মানুষ যখন পৃথিবীতে আসে তখন শুধু মাত্র একটা পেট নিয়ে আসে না সেই সঙ্গে একটা মাথা এবং দুটো হাতও নিয়ে আসে। বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে উৎপাদন বাড়তে বাধ্য। প্রসূণ নানা ধরনের উদাহরণ দিয়ে অতি সহজভাবে বুঝিয়ে দিল যে পরিবার পরিকল্পনা আর কিছুই নয়—শাসক তথা শোষক শ্রেণীর নিজের দুর্বলতাকে ঢাকার একটা নোংরা প্রবৃত্তি মাত্র। এবং এও বুঝিয়ে দিল যে

পরিবার পরিকল্পনার পেছনে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর হাত আছে। পৃথিবীর প্রতি পাঁচ জনের একজন চীনা হওয়া সত্ত্বেও চীনে জন্ম-আধিক্য কোনো সমস্যাই নয়।

সবশেষে প্রসূন একটা অতিবাস্তব উদাহরণ রাখল যে পরিবার পরিকল্পনা যদি সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতো তা হলে সত্যসুন্দরও এই বিশেষ আলোচনাটি থেকে বঞ্চিত হতো। বলা বাহুল্য সত্যসুন্দর তার বাবার পঞ্চম পুত্র।

॥ তিন ॥

মনে হয়েছিল ভদ্রলোক বোধ হয় রিক্সা করবেন তাই এদিক ওদিক চাইছেন। কিন্তু অনেকগুলো খালি রিক্সা পাশ দিয়ে চলে যাবার পর আমাদের ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হলো।

দু একটা বাস হর্ণ দিয়ে ধূলার ধরণীর 'পাউডারের' সঙ্গে পেট্রোলের নির্যাসটা মিশিয়ে চলে গেলো।

রাস্তার বাঁ পাশ দিয়ে ওরা আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। কালোকাপড় দিয়ে তৈরী ছাতা নামক বস্তুটি ওদের না থাকার দরুণ শক্তির উৎস সূর্যালোক ওদের সারা দেহে সাড়া দিয়ে যেতে কার্পণ্য বোধ করছে না।

"মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ মাটির মালিক তাহারই হন"—ব্যক্তিদের মতো সর্দিগর্মি লাগার ভয় ওদের নেই। অনিচ্ছাকৃত দৈহিক অবহেলায় ওরা প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। ওরা এগিয়ে যাচ্ছে, সোজা রাস্তাটা দিয়ে। মাঝে মাঝে বাঁক নিচ্ছে। রাস্তার ধারের গাছগুলো আর রংচং-এর হরেক রকম বাড়ীগুলো এই নিঃস্ব মানুষগুলোর চলার সাক্ষী হয়ে থাকছে। ভদ্রলোক হঠাৎ একটা বিরাট বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো। বাড়ীটার মধ্য থেকে কিসের জানি একটা আওয়াজ আসছে! বুঝতে ভুল হলো না শোষণের চাপে জর্জরিত শ্রমিকের ক্রন্দন ধ্বনি মিশে আছে ঐ শব্দটার সঙ্গে। "ফ্যাক্টরী"—'কারখানা' পুরোনো স্মৃতি মুচড়ে উঠল। না আর ঐ যন্ত্র-দানবগুলোর সামনে আর ওকে দাঁড়াতে হবে না। কারখানার মালিক লকআউট করে তাকে মুক্ত করে দিয়েছে।

আবার ওরা হাঁটতে শুরু করল। ইতিমধ্যে বাচ্চা দুটো আর 'নবজাতক' কোলে ওদের মা কিছুটা বিশ্রাম করে নিয়েছে।

বাঁদিকে কারখানার সীমানা বরাবর পাঁচিলটার গায়ে লেখা—শ্রমিক যদি

বাঁচতে চাও, কৃষি বিপ্লবে নেতৃত্ব দাও" পোষ্টারটা জ্বল জ্বল করছে। সোজা এগিয়ে যাচ্ছে ওরা।

"ধনিয়া খালির" জোতদার দিপ্তেন্দু সিংহরায়ের "রোলস রয়েজ" গাড়িটা বেশ কিছুটা ধূলো উড়িয়ে চলে গেল।

আর কিছুটা যাবার পর ওদের সামনে কিছুটা দূরে দেখা যাচ্ছে টকটকে লাল রঙে লেখা পোষ্টারটা "রাইফেল হাতে সশস্ত্র জনগণই শক্তির উৎস।"—

ওরা এগিয়ে চলল।

বাচ্চাগুলোর মায়ের ছানিপড়া চোখের তারা বোধ হয় জ্বল জ্বল করে উঠল। ওরা পাঁচজনে এগিয়ে যাচ্ছে।

ওদের দশটি হাতে আগামী দিনে পাঁচটি রাইফেল ধরার শপথ। পেছুনে লাল রঙে লেখা পোষ্টারটা জ্বল জ্বল করছে—

"এ আজাদী ঝুটা হ্যায়—
দেশকা জনতা ভূখা হ্যায়.....।"

"বিপ্লব কোনো ভোজ সভা নয় বা প্রবন্ধ রচনা বা চিত্র-অঙ্কন কিংবা সূচীকর্ম নয়; এটা এত সুমার্জিত, এত ধীর স্থির ও সুশীল, এত নম্র, দয়ালু, বিনীত সংযত ও উদার হতে পারে না। বিপ্লব হচ্ছে বিদ্রোহ—উগ্র বল-প্রয়োগের কাজ, যার দ্বারা এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে পাল্টে দেয়।"

—মাও সেতুঙ্

যদি

সোমা সেন
দ্বিতীয় বর্ষ, উদ্ভিদবিদ্যা

ভাবছিলাম, আমার কিছুদিন আগে ছাখা বিদেশী ছায়াচিত্রটি।

নীলচে সবুজ পাহাড়ের সারি।.....

আরও কাছে—একেবারে পাহাড়ের নীচে দাঁড়ালে দেখতে পাওয়া যাবে—গভীর সবুজ বনে ঢাকা পাহাড়ের গা।.....অনেক ... অনেক উঁচুতে, পাহাড়ের প্রায় চূড়োর কাছে ছাখা যাচ্ছে সাদা একটি সেতু। যার তলা দিয়ে উদ্দাম বেগে ছুটে আসছে খরস্রোতা পাহাড়ী নদীটি। উজ্জ্বল নীল জল আছড়ে পড়ছে, পাথরে পাথরে—ফেনিয়ে উঠছে—ঝরে পড়ছে নীচের দিকে।

সাদা সেতুটা এবার বেশ স্পষ্ট ছাখা যাচ্ছে। ছাখা যাচ্ছে, বনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসা রাস্তাটা—যেটা এসে মিশেছে ঐ সেতুটার সঙ্গে।

.....একটা সাঁজোয়া গাড়ী আসছে না—রাস্তাটা দিয়ে?—গাড়ীটা আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ায় সেতুর সামনে। কারা যেন নামছে গাড়ী থেকে..... একদল সশস্ত্র রক্ষী, ওরা টেনে নামাচ্ছে হাত পা বাঁধা এক যুবককে। বন্দী বোধহয়।

.....কি যেন করছে ওরা। যুবকটিকে মনে হচ্ছে ফাঁসি দেওয়া হবে, তারপর ফেলে দেওয়া হবে ঐ পাহাড়ী নদীর দুর্বার স্রোতে।.....

কিরকম যেন হতাশ আর অবসন্ন মনে হচ্ছে যুবককে। ও বোধহয় ওর এই গোনা গুণতি শেষ মুহূর্ত কটা অনুভব করতে চাইছে—মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।—

রক্ষীরা বেশ তৎপরতার সঙ্গে যুবকটির অন্তিমযাত্রার আয়োজন প্রায় শেষ করে ফেলেছে—আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরই যুবকের দেহ ঝুলবে ঐ ফাঁসির দড়ি থেকে। তারপর তাকে ফেলে দেওয়া হবে ঐ হিমশীতল, গাঢ়নীল জলে। ঐতো ওরা বন্দীকে নিয়ে এসেছে সেতুর একেবারে কিনারে—তাকে মৃত্যুর ওপারে পৌঁছে দেবে যে দড়িটা, সেটা এবার দুলে ওঠে।—

প্রচণ্ড একটা শব্দ—কি হল? দড়িটা কি ছিঁড়ে গেল নাকি? অনেক ওপর থেকে যুবকের দেহ, শূন্যে ঘুরপাক খেতে খেতে জলে এসে পড়ছে। .....আঃ দড়িটা ছিঁড়ে গেছে.....জলের উপর পড়েই দেহটা প্রথমে ডুবে যায় .....এক রাশ গাঢ় নীল অন্ধকার—আর কিছু না.....ঐ তো জলের থেকে মাথা তুলতে পেরেছে যুবক.....হাত পায়ের বাঁধন ফেলেছে ছিঁড়ে প্রাণপণে চেষ্টা করছে সে ভেসে ওঠবার.....পরক্ষণেই নজরে পড়ে তার, সেতুর ওপর থেকে বিভ্রান্ত রক্ষীরা গুলীবর্ষণ করে চলেছে তার দিকে.....আবার ডুব দেয় সে.....

জলের স্রোত তাকে নামিয়ে এনেছে অনেক নীচে.....মাথা তুলে চেয়ে দেখে যুবক, গুলীর আওতার বাইরে চলে আসতে পেরেছে সে। সেতুর ওপর দাঁড়ানো রক্ষীদের বিমূঢ় অবস্থা কল্পনা করে সে হেসে ফেলে।

.....বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে তাকে, জলের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় ছেলেটি, ...আস্তে আস্তে ভাবতে থাকে। এই না এক্ষুনি সে এইসব সবুজ বনে ঝলমল করে ওঠা সোনালী আলোয় ভরা পৃথিবীটা ছেড়ে চলে যেতে বসেছিল.....আঃ সে আবার দেখতে পাবে এমনি সুন্দর রোদ্দুর মাখা সকাল—ঐ সব সবুজ গাছের,—শুকনো পাতার খসখসানি শুনতে শুনতে ঝরাপাতা মাড়িয়ে অনেক দূর হেঁটে যেতে পারবে সে—যেতে পারবে তার লাল ছাদ দেওয়া ছোট্ট বাড়ীটাতে..... অনেক পাখী ডাকছে না? অনেক পাখী। সে কি অনেক দিন পাখীর ডাক শোনেনি?—শোনেনি তাদের গীর্জের রূপোর ঘণ্টাটার মিষ্টি আওয়াজ?.....নদীর একেবারে ধারে এসে পড়েছে সে। কোনও রকমে তার পায়ে ঠেকে যায় সবুজ মাটি খানিকটা,.....তীরে উঠেই ছুটতে শুরু করে সে.....খানিকটা মাঠ পেরিয়ে বন.....দু'হাতে গাছপালা সরিয়ে পাগলের মত ছুটছে সে.....বন ক্রমশ হালকা হয়ে আসছে.....সামনে ছোট্ট টিলা.....টিলার ওপর ঐ তো দেখা যাচ্ছে

তার লাল ছাদ দেওয়া ফুল বাগানে ঘেরা ছোট্ট বাড়ীটা——আরও জোরে ছুটতে থাকে সে——ঐ তো চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।—সে এবার শুনতে পাচ্ছে তার কুকুরটার ডাক——আর ঐ তো জানলার পর্দার ওপরে সে দেখতে পেয়েছে তার স্ত্রীর মুখখানি। হাত তুলে তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে যুবক। তারপর দ্রুত উঠতে থাকে টিলার উপর.....হ্যাঁ সে-ও দেখতে পেয়েছে—ছুটে আসছে সে-ও। লাল রুমালে বাঁধা সোনালী চুলের গুচ্ছ উড়ছে——

——আবার একটা প্রচণ্ড শব্দ——ঝুলিয়ে দেওয়া দড়িটা যুবকের একটু কেঁপে ওঠা নিষ্প্রাণ দেহটা নিয়ে সশব্দে জলে পড়ে——জলের মধ্যে একটা ঘুর্ণী—আর কিছু না।——

পাহাড়ের বনের মধ্যে দিয়ে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে হু হু করে বাতাস বয়ে যায় শুধু।——

———

"সাম্রাজ্যবাদটা কী? সবচেয়ে ধনী শক্তিগুলির একটি চক্র, তারা দলন করছে গোটা দুনিয়াটাকে এবং জানে যে দেড়শ' কোটি লোক তার অধীন। তাদের দলন করছে তারা এবং এই দেড়শ' কোটি লোক টের পাচ্ছে ইংরেজ সংস্কৃতি, ফরাসী সংস্কৃতি আর মার্কিন সভ্যতার মানে কী। তার মানে: যাকে পারো, যেখানে পারো লুঠ করো।"

—লেনিন

"আমাদের দেশের সশস্ত্র বাহিনী ও সারা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ একজন মানুষের মত ঐক্যবদ্ধভাবে বিপ্লবী বীরত্বে অবিচল রয়েছেন এবং দক্ষিণকে মুক্ত করার, উত্তরকে রক্ষা করার এবং দেশকে শান্তিপূর্ণভাবে পুনর্মিলিত করার উদ্দেশ্যে তারা যতদিন পর্যন্ত না মার্কিন সৈন্যদের সম্পূর্ণ সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং যতদিন পর্যন্ত না ক্রীড়নক বাহিনীর ও সরকারের অবলুপ্তি ঘটছে ততদিন পর্যন্ত ত্যাগ ও দুঃখবরণকে ভয় না করে এবং লড়াই করার ও জয়ী হওয়ার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে ও তাকে তীব্রতর করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।"

—হো চি মিন

[ভিয়েতনাম দিবসের বাণী, ২০শে জুলাই, ১৯৬৯]

হো চি মিনের কবিতা

হাজার কবিতা পড়ে

এমন একদিন ছিল যখন আমরা
নিশ্চিন্তে গান গাইতে পারতাম,
আমাদের কবিতায় ছিল
এক রূপময় নদীর কথা,
পাহাড় পর্বত আর বাতাসের কথা,
সেদিন আমাদের কবিতায় ছিল
চন্দ্রমল্লিকার ভালবাসা আর
বরফের সাদা চুল।

কিন্তু এখন
দিনকাল অনেক পালটিয়ে গিয়েছে,
আমাদের কবিতায় এখন ইস্পাতের ঝন্ ঝন্ আওয়াজ—
মুক্তির ললিত লগ্ন।

———

প্রতিরোধ

অপূর্ব মজুমদার
(বিদায়ী) তৃতীয় বর্ষ, রাষ্ট্র বিজ্ঞান

মাথা নত, হে আফ্রিকার ক্রন্দিত আত্মা,
বিষাক্ত দেহে তুমি তিলে তিলে মারা যাও,
কিন্তু জাননা কেন মৃত্যুর ঘন্টাধ্বনি বাজে।
ক্ষেতে, কারখানায় তুমি খেটে মর
আর লুব্ধ চোখে তাকাও বিশ্রামরত লোকটার দিকে।
তোমার মুখের হাসির শেষ চিহ্নও ক্ষীয়মান,
উজ্জ্বল চোখের তারা হয়ে গেছে ম্লান।
আমার কালো ভাই, শতবর্ষের লাঞ্ছনায়
তুমি আজ ভীত সন্ত্রস্ত, যন্ত্রণায় অবসিত।
তবু একবার প্রতিবাদে গর্জে ওঠ।
বল, "আর পড়ে থাকা নয়", যন্ত্রণার দিন হয়েছে সাঙ্গ

মূল রচনা

Defiance against force—David Diop.
(Senegal)

"সারাদুনিয়ার জনগণ, ঐক্যবদ্ধ হোন, মার্কিন হামলাকারী ও তার সমস্ত পদলেহী কুকুরদের পরাজিত করুন! সারা দুনিয়ার জনগণ, নির্ভীক হোন, লড়াই করতে সাহসী হোন, বাধা-বিপত্তিতে নির্ভয় হোন, তরংগমালার মতো এগিয়ে চলুন, তাহলে সারা দুনিয়াটাই হবে জনগণের। সমস্ত দানব সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হবে।"

—মাও সেতুঙ

রক্তের কণিকায় ভিয়েৎনাম

দিলীপ রায়
তৃতীয় বর্ষ, দর্শন

আমার রক্তের কণিকায় ভিয়েৎনাম খেলা করে—
বিধ্বস্ত প্রাণে বরফগলানো উত্তাপ যুগিয়ে
আমার রক্তমাংসের শরীরটাকে চাঙ্গা করে দেয়।
একটা জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস—অনেক অনেক তরঙ্গ
আমায় উত্তাল করে—
নীল সমুদ্রের ঢেউ আমায় নিয়ে আসে
শ্যামলানী দ্বীপে—
আমায় রাইফেল তোলার সাহস দেয়
অনেকগুলো নদীর পাড় আঁচলে জড়িয়ে সাগরিকা
ভিয়েৎনাম আমায় চেতনা দেয়—
মাতাল করে তোলে শক্তির আঘ্রাণে।

একই চেতনা নিয়ে আমার রক্তের কণিকায় ঝড় তোলে
শ্রীকাকুলাম ওয়াইনাদ বরদলং মুশাহারি—
লক্ষ লক্ষ স্বপ্নদেখা চোখের মণিগুলো যেখানে জ্বলে উঠেছে
জীবনের মহত্তম স্বাদে সূর্য্য যেখানে আরো লাল
রক্ত ঝরা স্বাধীনতা আনার প্রতিজ্ঞায়
বাতাস যেখানে বারুদগন্ধী—
যেখানে বিন্দু বিন্দু রক্ত জমে রক্তগোলাপ ফুটেছে
চল না! আমিও সেখানে যাবো!
'আহা আমি লড়াই করবো
লড়াই লড়াই
দেশ যে আমার মুক্তির সংগ্রামে।'

———

শহীদ বাবুলালের উদ্দেশে

শঙ্কর দাশগুপ্ত
তৃতীয় বর্ষ, রসায়ন

কমরেড ! এখনও ঘুমিয়ে ?
রাত্রি কী হয়নি শেষ ? জেগে ওঠেনি কি বিশাল ভারতবর্ষ ?
চেয়ে দেখছ না আকাশের রঙ কী গাঢ় লাল,
অভুক্ত কিষাণের কণ্ঠে জঙ্গী প্রতিজ্ঞার সুর—
দিন আগত ঐ। সহস্র বৎসরের
লাঞ্ছনা, পীড়ন আর অসম্মানের আজ অবসান ;
তরাই-এর বুকে তাই দৃঢ় প্রতিরোধ।
বরফ গলছে। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে
হাজার বছরের দাসত্বের ভিত ; শুনছ না
মুখর হয়েছে নীরব হিমাচল, চেয়ে দেখ
তিস্তার বুকে জোয়ারের কী ভৈরব উচ্ছ্বাস !
শ্রমিকের হাতে ওড়ে মুক্তির নিশান—
নকশাল, শ্রীকাকুলাম গিরিজন মুক্তিযুদ্ধ
দিকে দিকে জনতার নির্মম সংগ্রাম ;
বিপর্যস্ত ধনতন্ত্র, জনতার ব্যগ্র অভ্যুত্থানে
নির্মম আঘাত হানে নিষ্ঠুর শোষণ ;
সহসা অধিক রাত্রে নেতৃত্বের ছায়ার আড়ালে
বীভৎস ছুরিকা হানে বিপ্লবী মুখোসপরা ঘাতকেরা যত—
এখনো কি তোমার-আমার ঘুমানো চলে, কমরেড ?

বাবুলাল ! ও কি !! সব শেষ ?
নিভে গেল বিদ্রোহের অগ্নিশিখা রক্তস্রোত মাঝে ?
শত শহীদের রক্তে রাঙা বিদ্রোহী বাংলা
আবার পরল কী রক্তরাজ টীকা নকশালের নিভৃত প্রান্তরে,
বুড়িবালাম, চট্টগ্রাম, কাকদ্বীপ আর আজাদীর দুর্জয় সংগ্রাম
মিলে গেল কিষাণের বাঁচার লড়াইয়ে ;
না না ! আজ কোন শোকোচ্ছ্বাস নয়,
দোহাই তোমার ! নয়নে না থাকে যেন একবিন্দু অশ্রুজল
আজ শুধু বদলা নেওয়ার দিন । শ্রমিক আর কৃষকের
মিলিত সংগ্রাম শোষক আর শাসকের সমাধি রচনা করে
ধ্বংসস্তূপ মাঝে ;
বিদায় কমরেড ! উঠেছে পূবের হাওয়া,
এবার লড়াই তবে, শুরু দিনবদলের পালা ।

"সংগ্রামে বলিদান অনিবার্য, মানুষের মৃত্যু স্বাভাবিক । কিন্তু আমরা যদি জনগণের স্বার্থ এবং সংখ্যাধিক জনগণের দুঃখ দুর্দশা মনে রেখে জনগণের জন্য মৃত্যুবরণ করি তাহলে আমাদের মৃত্যু সার্থক হবে ।"

—মাও সেতুঙ্

ইঙ্গিত

কমলকান্তি ঘোষ
দ্বিতীয় বর্ষ, গণিত

বিদ্রোহী মনের সহস্র জিজ্ঞাসা
নূতন সৃষ্টির আশা ;
প্রলয়ের নিশান হাতে লাল পতাকা
ওটা আমাদের ভাষা ;
যা' বলে দেবে আমাদের—
নূতন সৃষ্টির ইতিহাস।
তাই ওকে তুলে ধরে বলি, তুমি শক্তি,
ভাঙ্গ অন্যায়, আন ন্যায়,
তুমি তারই আশা।

লাঞ্ছিত, নিষ্পেষিত, সাধারণ মানুষের রক্তে
মাটির বুক হয়েছিল লাল ;
সেই রক্ত হাতে মেখে,
সংগ্রামী মানুষের বুকে ছাপ এঁকে দিই ;
এটা বাঁচার নিশানা।
তাই রাঙ্গিয়ে নিয়ে দুই হাত—
চলেছি সাধারণ মানুষের সাথে ;
যারা খোঁজে বাঁচার ঠিকানা।

শোষিত মানুষের চোখের জলে—
মুছে গেছে তিলে তিলে,
ভেসে গেছে লালসার জোয়ারের টানে—
মানবতা, সামাজিকতা, সভ্যতা, সুন্দর ;
জানিনা কোথায় তার শেষ।
তবু যাব—
রক্তিম নিশানা নিয়ে,
যত দূরে খুশী।
সর্বহারা মানুষের অস্থি-গড়া
চাবুকের ঘায়ে,
অন্যায়ের ইমারত ভেঙ্গে
শোষিতের মুখে আনবে হাসি।
একসাথে কণ্ঠ দিয়ে ক'বে—
সত্য, সুন্দর,
তোমার অপরূপ সৃষ্টিকে,
ফিরিয়ে এনেছি।
ঐ দেখ দিগন্তের বুকে—
নূতন সকাল,
লালে লাল!

———

"শ্রেণী সমাজে বিপ্লব ও বিপ্লবীযুদ্ধ অপরিহার্য, তাদের বাদ দিয়ে সমাজ বিকাশের দ্রুত-অতিক্রমণ সম্পন্ন করা এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণীকে উৎখাত করা অসম্ভব। অতএব জনগণের পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা অসম্ভব।"

—মাও সেতুঙ্

পুবের হাওয়া

প্রমল কুমার সামন্ত
দ্বিতীয় বর্ষ, প্রাণী বিদ্যা

আমার এই সর্বহারা জীবনটা,
এতদিন শুধু পুঞ্জীভূত—অস্পষ্ট
বেদনা—কিংবা হতাশা—
তাই বা বলি কেন—শয়তানের সাথে
পাঞ্জা লড়ার মদমত্তে শোণিতে শোণিতে
ঈথার তরঙ্গ তুলেছিল।
সর্বহারা থেকে দূরে সরে গিয়ে আমি
বিলাত ডিগ্রির মোহে—
তথাকথিত ভালোছেলেদের গল্পে
মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।
গোটাকতক বিলিতি ডিগ্রি নামের পিছুনে
আর সাধারণের দেওয়া কাগজে বিরক্ত মুখে
গোটাকতক স্বাক্ষর
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে ঘরণীর সাথে ফোনালাপ
অফিসে আসা আর অফিস থেকে যাওয়ার পথে
সুগন্ধিত রুমালে মুখ মুছে একটা
চারচাকার যন্ত্রদানবে চাপা—গোটাকতক
সেলাম কুড়িয়ে—
এত কথা হয়তো, ভেবেছিলাম
কোন অলস মুহূর্তে—আমার মধ্যবিত্ত চিন্তা নিয়ে।

ঠিক এই সময়েই পুবের একটা দমকা হাওয়া
এসে আমায় নিয়ে গেল অনেক দূরে—
অনেক মানুষের ভিড়ে—

যেখানে 'রোলস্ রয়েজ' চলে না—
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষ করে সেখানে
ফসল তুলে দিতে হয় জোতদারের গোলায়—
যেখানে আট ঘণ্টা হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও
শ্রমিকের ছেলে মরে পথ্যের অভাবে —
পেটের অগ্নিমান্দ্যব নিয়ে।
অভুক্ত অবস্থায় যে দেশে
ছাত্রকে আসতে হয় "লেখাপড়া" নামক ওষুধ
গিলতে,
যে ওষুধের কাজ হলো শুধু "শিক্ষিত বেকার"
কথার সংযোজনে।
'ভুখাজান্তা' যখন নবযুগ
আনবার চেষ্টায় বিপ্লব ঘটায়
তারা সুবিধাবাদীর কাছে হয়ে যায় "হটকারী"।
আর কলকাতার রাস্তার মোড়ে ফুলের মালা পরে
যারা পুলিশের গাড়ীতে ওঠে গণআন্দোলনের নামে
তাদের বলে নেতা।
পূবের দমকা হাওয়া আমায় তাই
শিক্ষা দিয়ে গেছে—
সে হাওয়া শুধু আর পূবে সীমাবদ্ধ থাকবে না—
উত্তর—দক্ষিণ—পূর্ব—পশ্চিম কোণে আগামী ঝড়ের
সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গেছে।

দু'টি কবিতা

কখনও রক্তোচ্ছ্বাসে

শেখর ভট্টাচার্য্য
দ্বিতীয় বর্ষ, দর্শন

পৃথিবীর ধূসর মাটিতে সকল সূর্যেরা
আজ প্রার্থনারত।

কালো হাতগুলো এখানে
বীভৎস ধারালো নখের অধিকারী—
তাই লাল পাঁজরের মানুষগুলো
এই অশুভকে চূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর।
লক্ষ নক্ষত্রের শক্তি তাই সমন্বিত।.....

কখনও রক্তোচ্ছ্বাসে দুর্লভ কবিতার
জন্ম হয়
দস্যুর পায়ের তলা কেঁপে ওঠে—
মানুষ অটল হয়
দুনিয়া কাঁপানো ঝড় ওঠে,
সহস্র দধীচির অস্থি তখন সুদৃঢ়,
বিস্ফোরক কবিতার জন্ম দেয়
পৃথিবীতে হাজার সূর্যেরা ।।

চলো যুদ্ধে যাই

চলো যুদ্ধে যাই।
মৃত্যুকে খেলনার মত
হাতে রেখে
চলো যুদ্ধে।

সত্য আমাদের জড়ো করেছে।
বিজয় বলেছে, সে আমাদের জন্যে।
অতএব পদক্ষেপ দ্রুত হোক,
মৃত্যুকে খেলনার মত
হাতে রেখে
চলো যুদ্ধে যাই।
বিজয় বলেছে, একটা সবুজ পৃথিবী নিয়ে
সে অপেক্ষা করবে।
তাই
সময়কে ঝড়ের সাথে বেঁধে নিয়ে
চলো যুদ্ধে যাই ।।

"ভারতীয়, চীনা, কোরীয়, জাপানী, পারস্যীয়, তুর্কী শ্রমিক ও কৃষক যখন হাতে হাত দিয়ে মুক্তির সাধারণ লক্ষ্যে কদম বাড়িয়ে যাবে, কেবল তখনই সুনিশ্চিত হবে শোষকদের ওপর চরম জয়লাভ।"

—লেনিন

সেই ছেলেটি

শমীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত
দ্বিতীয় বর্ষ, রাশি বিজ্ঞান

বছর বারো কি তেরোর কিশোরটা
ওর রুগ্‌ণ হাড়ের ডান হাতটি বাড়িয়ে দিলো
শুধু কয়েকটা বাদামের প্রত্যাশায়।
বয়সের তুলনায় নেহাৎই রুগ্‌ণ ওর দেহটা,
পাঁজরার আবরণে ঢাকা পড়া হৃদযন্ত্র
এখনও স্পন্দিত হয় আশায় আশায়।
(ওর) শরীরের কৈশোর চঞ্চলতার
সমস্তটাই কেড়ে নিয়েছে ওরা,
যারা ওর বাবাকে ঠেলে দিয়েছে যক্ষা-রোগ-শয্যায় ;
আর ওর মাকেও বাধ্য করেছে ঘুরতে
শুধু কয়েক মুঠো ভাতের জন্যে
একের বাড়ীর দোর থেকে আরেকের দোরে।
আজ এই হাড় বার করা কিশোরটি
কোন একক নয়,—
ও আজ রূপ নিয়েছে পথে ঘাটে।
আজ ওর মতো বাদাম-প্রত্যাশীরা
ফেরে মানুষের ভিড়ে,—
অপমান আর পেটের অগ্নিমান্দ্য নিয়ে ।।

মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে

সাধন মণ্ডল
তৃতীয় বর্ষ, উদ্ভিদবিজ্ঞান

তবুও নিগূঢ় বার্তা
কানে আসে, কাছে আসে—আরও কাছে।
যখন বিমূর্ত রাত শব্দহীন প্রহরের
প্রত্যয়কে গুনে ফেলে প্রতীকীর ছাঁছে,
তখন তারার রাত, চন্দ্রালোক মরিমরি
বাহারি জোছনা—
এবার আমরা গেছি ওখানে
চিরন্তন চিন্তা আর বিস্ময়ের ঢেউ—
আজ তার মাঝখানে স্থিতধীর মতো,
টলমল রোশনাই আমাদের অধ্যায়ের পাতায় পাতায়
ঢেউ-এর মাথায় জ্বলে হাজারো মাণিক—
"চাঁদমামা টিপ দাও"—অর্বাচীন কথা,
আমাদেরই পদব্রজ ভৃগুর মতন।

এ নিবিড় গ্রহটার চির চেনা আলো আর হাওয়া—
কেন বা স্বীকৃতি দেব ? বুদ্ধিবৃত্তি কল্পনা, আর
যাই কিছু—সীমাহীন অবসাদ—অতন্দ্র প্রহরী।
এখানে তাকিয়ে দেখো জরাজীর্ণ জীবনের ক্ষুধামন্দ্র ছায়া

দারিদ্র্যের লেলিহান জিহ্বা জ্বলে বাতাসের স্তরে ;
রক্তাক্ত দিনের ক্লান্তি, মুছে যাওয়া বিগত অশ্রুর
নিদাঘ,
অস্বীকার করে যাওয়া নিপীড়িত জীবনের
দাবীর উদ্রেক—
নিশ্চিত জেনেছি তবে,
হতাশার বারুদের ঘ্রান আর চাপে
এই এমন চাঁদটার মূল্য যাবে কমে—
জীবন যুদ্ধে জেনো হবে অভ্যুদয়,
চাঁদের শিলায় তবে কাটবে আঁচড়।

"নিপীড়িত জনগণ ও নিপীড়িত জাতির নিজেদের মুক্তির আশা কোনমতেই সাম্রাজ্যবাদ ও তার পদলেহী কুকুরদের "শুভবুদ্ধির" উপর ন্যস্ত করা উচিত নয়, কেবলমাত্র নিজেদের ঐক্যকে সুদৃঢ় করে অটল ভাবে সংগ্রাম চালিয়েই তাঁরা বিজয়লাভ করতে পারেন।"

—মাও সেতুঙ

ঝড়

অপর্ণা বসু
দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা

ঝড় উঠবে—পশ্চিমাকাশে মেঘের ভ্রূকুটি।
দীর্ঘ অজন্মা মাটির বুকে ফলবে সোনার ফসল,
এ ঝড় তারই ইঙ্গিত—

এ ঝড় শুভ—এ বৃষ্টি ফলদায়িনী,
এ প্লাবন শস্য শ্যামলা।

উঠুক ঝড়, নামুক বৃষ্টি, আসুক বন্যা—
খুশীর তুফান ভাসিয়ে নিয়ে যাক্
শত সম্ভাবনাময় এ টুকরো জমিকে।

যাক্ যাক্ ভেঙে ভেঙে খান খান হয়ে যাক···
দীর্ঘ বছরের রৌদ্রকর দিনে,
শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন রুদ্ধ বাতাস রাত্রি
দিয়ে গড়া একটি মাত্র
সুখের কুটির···

ভালোবাসার সমস্ত রস নিঙড়ে দিয়েও
ফুল ফুটাতে পারেনি তার প্রাঙ্গনে,
হৃদয় শোণিত ঢেলে দিয়েও

প্রেমের লতা বাহার সাজাতে পারেনি
তার দুয়ার…
সে কুটির যাক্ ভেঙে।

মাটির বুকে গুরুভার
তুচ্ছ একটা মনের, ছোট্ট একটা চালা,
কেবল বহন করার বিরক্তি…
অনাবশ্যক, অযাচিত, অনাদৃতের অস্তিত্ব
যাক মুছে।

উঠুক ঝড়, নামুক বৃষ্টি, আসুক বন্যা।
শুভ সম্ভাবনাময় হয়ে উঠুক
অনাবাদি জমি।

"পৃথিবীতে কোথাও সোজা পথ নেই, আঁকাবাঁকা পথে চলার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে, কখনো সস্তায় কোনকিছু লাভের চেষ্টা করা উচিত নয়। এটা মনে করা উচিত নয় যে, কোন এক সুন্দর ভোরে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরা স্বেচ্ছায় হাটুগেড়ে বসবে। এক কথায়, আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, কিন্তু পথটা আঁকাবাঁকা। আমাদের সামনে বহু বাধাবিপত্তি রয়েছে, যা আমাদের উপেক্ষা করা উচিত নয়। আমরা সমগ্র জনগণের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমবেত প্রচেষ্টায় অবশ্যই বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে ও বিজয় অর্জ্জন করতে সক্ষম হবো।'

—মাও সেতুঙ্

শতকী

সিদ্ধার্থ পুরকায়স্থ
দ্বিতীয় বর্ষ, পদার্থ বিজ্ঞান

তোমাদের আমাদের কোনদিন হবে নাকো কিছু।
এতটুকু নিরুত্তাপ নিরালার কামনায় নীলিমাও উধাও দু'বাহু
ক্ষুধিত সূর্যের ক্ষোভে দগ্ধ হবে। অগ্নিক্ষরা দিনের বিদ্রূপে
লজ্জা পাবে। ম্লান হবে পথভুল কাজশেষ গোধূলির তৃষা
অনেক অগাধ রাতে স্বাতীর নীরব চোখে মেলা
তোমার অনেক সাধ। তারাহারা ঝরোঝরো রাতে
ঝাউবনে ঝিরিঝিরি আমি-আছি-তুমি-নেই অনেক পিপাসা,
ফুলহারা ফলহীন বন্ধ্যা কোন ক্রন্দসীর বিষণ্ণ মর্মরে
চিরায়ত দীর্ঘশ্বাসে ব্যাপ্ত হবে ব্যর্থতার হলুদ আর্তিতে।
আমাদের দিন আছে—অসংখ্য মুখর তপ্ত দিন—
নিরুত্তেজ নিমেষের খোঁজ নেই, নেই ঠাঁই নীল মুহূর্তের ;
আমাদের রাত্রি আছে— রৌদ্রদগ্ধ দিবসের ক্লান্ত পরিশেষ—
রজনীগন্ধার বৃন্তে অভিজাত সন্ধ্যা—সে তো বহুদিন হ'লো ইতিহাস ।
আমাদের আজ-কাল-পরশুতে এমন অনেক সন্ধ্যা আসে, চলে যায়
এমনি অনেক রাত কামনার শব বয়ে নীরবে ফুরায়।
তারও বহু, ব—হু যুগ পরে
রক্তরিক্ত, লুপ্তবোধ, বর্ণহীন শিরায় শিরায়
তারার আহ্বান আসে ; ফুরায় মাছির শেষ রুগ্ন পাখা নাড়া
হিজল পাতার বনে ভোরের চকিত চোখে ঝিকিমিকি জীবনের
ঈষৎ ইশারা
শেষ হয়।
শেষ হয় ?
জানি নাকো।
হয়তো আমরা তবু থেকে যাই অন্য নামে,
অন্য কোন তৃপ্তিহীন তৃষ্ণা-কামনায়
হয়তো আবার ফিরি শক্তিহীন অনিচ্ছায় স্থান করে নিতে
অভিশপ্ত শতাব্দীর অবসন্ন সবিতার দুর্বল দীপ্তিতে।

সিদ্ধার্থ পুরোকায়স্থ

জন্ম ঃ ২১শে মার্চ, ১৯৫২ মৃত্যু ঃ ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮

সিদ্ধার্থের অকাল-মৃত্যুতে আমরা গভীর শোকাহত।

একটি আলোচনার খসড়া

চলচ্চিত্র ঃ সমাজব্যবস্থা রক্ষার ভূমিকায়

স্বপন মালাকার
(বিদায়ী) তৃতীয় বর্ষ, পদার্থ বিদ্যা

"যদিচ মানুষের সামাজিক জীবনই হ'ল শিল্পকলার একমাত্র উৎস এবং এমন অতুলনীয় ঐশ্বর্য আর স্পষ্টতা অন্য কোথাও নেই, তবু মানুষ কেবলমাত্র জীবনটাকে নিয়েই পরিতৃপ্ত নয়। তারা শিল্প-সাহিত্যের দাবী তোলে। কেন তোলে ? কারণ, জীবন এবং শিল্প উভয়েই সুন্দর বটে, তথাপি বাস্তব জীবন যখন শিল্প-কর্মে প্রতিমূর্ত হয় তখন তা হয় আরো উন্নত, আরো ঘনীভূত। বলা যায় একটা টাইপ, একটা আদর্শের কাছাকাছি এবং এমনি করে তা একটা সার্বিক রূপ লাভ করে।"

—মাও সেতুঙ্

মানুষের জন্মলগ্ন থেকে বর্ত্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমবিকাশের ইতিহাস হ'ল মানুষের বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামের ইতিহাস। সেই সুদূর অতীতে আদিম সমাজের মানুষ প্রতিকূল প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে বেঁচে থাকার উপকরণ তৈরী করতে (বা, উৎপাদন করতে) যে প্রাথমিক উৎপাদন-যন্ত্র গড়েছিল তাতে ছিল সবার সমান অধিকার। ক্রমে একদল মানুষ এই উৎপাদনের হাতিয়ারগুলোকে তাদের নিজেদের মালিকানাধীনে এনে ফেলে। তখন থেকে সমাজের মানুষ মূলতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হ'য়ে পড়ে —শোষক ও শোষিত শ্রেণী। যাদের হাতে উৎপাদনের যন্ত্রগুলোর মালিকানা কেন্দ্রীভূত হয়, তারা শোষক শ্রেণী ; আর যারা উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা হারিয়ে ঐ পূর্বোক্ত শ্রেণীর শ্রম-দাসে পরিণত হয়,

তারা হ'ল শোষিত শ্রেণী। মানুষের বাঁচার লড়াই করতে গিয়ে, অর্থাৎ বাঁচার উপকরণ তৈরী করতে গিয়ে, বা সংক্ষেপে উৎপাদন করতে গিয়ে উৎপাদনের বাস্তব উপকরণকে ভিত্তি ক'রে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হ'ল। এই উৎপাদন সম্পর্কই হ'ল সমাজের মূল কাঠামো। এবং এই অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই সমাজের উপসৌধ (Super-Structure)—অর্থাৎ, রাজনীতি, দর্শন, শিল্প-সাহিত্য, ধর্মীয় রীতি-নীতি, সংস্কার, আচার-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ, আইন-কানুন ইত্যাদি—ঐ মূল কাঠামোর সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি রেখেই গড়ে ওঠে। "The mode of production in material life determines the character of the social, political and spiritual processes of life."[১]

আবার উৎপাদনও স্থির হয়ে নেই। উৎপাদনেরও সর্বদাই পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশ হচ্ছে। উৎপাদন-প্রকৃতির (mode of production) পরিবর্তনের সঙ্গে আসে সমগ্র সামাজিক ও রাজনীতিক পরিবর্তন—সামাজিক চেতনা ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। অথাৎ এককথায়, জীবনের মূল্যবোধই পাল্টে যায়। কেননা, "মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তার চেতনাকে নির্ধারিত করে।"[২]

"যে কোন সংস্কৃতিই (একটা আদর্শগত রূপ হিসাবে) হচ্ছে এক নির্দিষ্ট সমাজের রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রতিচ্ছবি এবং শেষোক্তটির ওপর পূর্বোক্তটির একটা প্রচণ্ড প্রভাব ও কার্যকারিতা আছে। অর্থনীতি হ'ল ভিত্তি এবং রাজনীতি হ'চ্ছে অর্থনীতির ঘনীভূত প্রকাশ।"[৩] তাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যারা প্রভুত্ব করে (অর্থাৎ উৎপাদনযন্ত্রগুলো যাদের দখলে থাকে), তারা রাজনৈতিকক্ষেত্রেও শাসক। এবং তাদের এই শাসনব্যবস্থা (বা, শোষণব্যবস্থাকে) কায়েম রাখার জন্য সমাজের সংস্কৃতিও তারা নিয়ন্ত্রণ করে। শিল্প-সাহিত্য, ধর্মীয় আচার-ব্যবহার, সংস্কার ইত্যাদি এমনভাবে রচিত হয় যাতে শাসকশ্রেণীর শ্রেণীস্বার্থে (অথাৎ, শ্রেণীপ্রভুত্ব বজায় রাখার স্বার্থে) কোনরকম আঘাত না লাগে। শোষকশ্রেণী সর্বদাই চেষ্টা করে যাতে শোষিতশ্রেণীর মানুষ তাদের সামাজিক অবস্থানকে বুঝতে না পারে ; তারা যাতে নীতিবোধ হারায়। তারা 'শিল্পের জন্য শিল্প' ইত্যাদি কথা ব'লে এমন সব সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা ক্রমশঃ

শোষিত শ্রেণীর মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেয়, যাতে শোষিত মানুষ উৎপাদন-সম্পর্ক পরিবর্তনের জন্য, বা সোজাকথায় বাঁচার লড়াই-এর জন্য মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। সমাজের যে দু'টি শ্রেণী উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত, তারা উৎপাদনের বিকাশ, বা সমাজের বিকাশের জন্য পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত—এবং এই উৎপাদন সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন করেই যে কেবল শোষিত মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তি সম্ভব—এই চেতনা থেকে দূরে রাখার জন্য শোষকশ্রেণী সমাজের সংস্কৃতিকে তার শ্রেণী-শাসনের হাতিয়ারে পরিণত করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বহু আগে থেকেই ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘনীভূত হচ্ছিল। সংকটের এই অক্টোপাশ একদিকে যেমন ইউরোপ আমেরিকার শোষকশ্রেণীগুলোকে গ্রাস করছিল, অন্যদিকে তেমনি এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন উপনিবেশের নিপীড়িত মানুষ শত্রুর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াতে আরম্ভ করছিল। ইউরোপ আমেরিকার শোষিতশ্রেণীও নিজেদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানকে দৃঢ় ক'রে পচাগলা ক্ষয়িষ্ণু সমাজের পরিবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার জন্য একদিকে যেমন পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধালো, তেমনি শোষিত নিপীড়িত মানুষের ওপর প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য সাংস্কৃতিক দিকেও একধাপ এগিয়ে এল। সাহিত্য-শিল্পে, আচার-ব্যবহারে অবাধ নগ্নতা শোষক শ্রেণীগুলোর আনুকূল্যেই প্রকাশ পেল। মানুষের নৈতিক মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত ক'রে তার সংগ্রামী চেতনা ধূলিসাৎ করার জন্য এই সংস্কৃতি বাহুমেলে এল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সংকটকে দূর ত করলই না, বরং আরও বাড়িয়ে তুললো। ইউরোপ আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা এখন আর পুরনো কায়দায় তাদের উপনিবেশগুলো শাসন করতে অপারগ হ'ল। তখন এল নতুন কায়দা, নতুন কৌশল। উপনিবেশগুলো থেকে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের প্রত্যক্ষ অবস্থান তুলে আনল অর্থনৈতিক লুণ্ঠনের সমস্ত ব্যবস্থাগুলোকে অটুট রেখে। উপনিবেশগুলোতে তাঁবেদার সরকার বসিয়ে তাদের শোষণ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখল। 'স্বাধীনতা'র নামে উপনিবেশ পরিণত হ'ল নয়া-উপনিবেশে! আমাদের দেশ ভারতবর্ষও একদিন মধ্যরাত্রির নিঃশব্দ ঘণ্টাধ্বনির মধ্য দিয়ে

"স্বাধীনতা" লাভ করল। বিদেশী প্রভুরা তাদের শোষণের কারখানায় বিদেশী ম্যানেজারের বদলে স্বদেশী ম্যানেজারকে বহাল করল।

কিন্তু দেশের মানুষের মনের আয়নায় যে সমাজ-চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে তাতে তারা ত আর চুপ ক'রে নেই! সংগ্রামের বন্যা বিদেশী প্রভুর সঙ্গে স্বদেশী ম্যানেজারকেও ভাসিয়ে দিতে চাইছে। তাই এল আরও নানা কৌশল। শক্তিশালী করতে হচ্ছে পুলিশ-মিলিটারী ইত্যাদির মত অন্যান্য হাতিয়ার-গুলোকেও। রাজনৈতিক দিক দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য পুরনো ম্যানেজারেরও বদল করতে হচ্ছে, নতুন ম্যানেজারকে গদীতে বসিয়ে। [মন্ত্রী সভায় 'কংগ্রেস' বদলে 'যুক্তফ্রন্ট'; 'যুক্তফ্রন্ট' বদলে 'কংগ্রেস' ইত্যাদি করতে হচ্ছে।] এবং তাতেও নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না। তাই অন্যান্য হাতিয়ারের সঙ্গে 'সাংস্কৃতিক হাতিয়ার'কেও জোরদার করা হচ্ছে।

যৌন-বিকৃতির অন্ধ গলিতে মানুষকে চালনা করে মানুষের চিন্তায় হালকা চটুল ধ্যানধারণা ঢুকিয়ে, হতাশার চোরাবালিতে মানুষকে ডুবিয়ে দিয়ে নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামকে শেষ করার চক্রান্ত হ'চ্ছে এবং হচ্ছে অনেকদিন থেকেই। তাইত দেখি বাংলা কবিতা-উপন্যাস-গল্পের মাধ্যমে যৌনচেতনায় সুড়সুড়ি দেওয়ার চেষ্টা। একদা 'মানুষের কথা-বলা' সাহিত্যিকদের রাতারাতি 'বোধোদয়' হচ্ছে; 'বিবরের' পাঁকে মানুষকে, মানুষের সুস্থ চেতনাকে ডুবিয়ে মারার মন্ত্রে দীক্ষা নেবার জন্য তারা যৌনতার উপবন সাগরপারের কোন এক মহাদেশে পাড়ি জমাচ্ছে ঘন ঘন এবং এদেশের মাটিতে তার ফসল ফলছে। শুধু বইয়ের কয়েকশ' পৃষ্ঠাতেই সে ফসল সীমাবদ্ধ থাকছে না। মাঠে-ময়দানেও সে ফসল ফলানোর চেষ্টা হচ্ছে পুরোদমে। খোলা ময়দানের বুকে 'মুক্ত' হাওয়ায় বিকৃত অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে নেচেগেয়ে, কুৎসিত নগ্ন ছবি টাঙিয়ে মানুষের চেতনা বিষাক্ত করার জন্য 'মেলা' বসানোর চেষ্টা চলছে। আর সারারাত্রি ধরে বিখ্যাত বা কুখ্যাত গায়ক ও অভিনেতাদের নিয়ে 'নাইট' উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এবং 'জনপ্রিয় মন্ত্রীরা'ও সে অনুষ্ঠানে গিয়ে আশীর্বাণী বিতরণ ক'রে আসছে!

কিন্তু আজকের যুগে মানুষের ওপর সবচেয়ে বেশী প্রভাব ফেলে সিনেমা ও টেলিভিশন। ভাগ্য ভাল, এদেশে এখনও টেলিভিশনের বহুল প্রচলন হয়নি। কিন্তু তার জন্য চেষ্টার অন্ত নেই! দেশের লোক দুমুঠো খেতে পাক বা না পাক,

দেশের ছেলেরা চাকরী পাক বা না পাক, বিদেশী প্রভুর স্বদেশী ম্যানেজাররা দেশের ঘরে ঘরে ঐ বস্তুটি পৌঁছে দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। অর্থাৎ শোষক শ্রেণীর সংস্কৃতিক হাতিয়ারকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা পুরোদমেই চলছে। কাজেই টেলি-ভিশনের অভাবে সিনেমাই এখন শাসকশ্রেণীর হাতে অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার। সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগ ছেড়ে আমরা কেবল এই বিভাগ নিয়েই আলোচনা করব।

বর্তমানে চলচ্চিত্র শোষকশ্রেণীর শুধু সাংস্কৃতিক হাতিয়ারই নয়, নিপীড়িত মানুষকে আনন্দ দানের নামে পকেট কেটে মুনাফা লোটারও অন্যতম হাতিয়ার। আমরা এখানে আলোচনা করব চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শোষকশ্রেণী কেমন করে তার শ্রেণী-আদর্শ প্রচার করছে, আর শোষিতশ্রেণীর মানুষের সমাজ-চেতনা বিপথে পরিচালিত করে শ্রেণী-সংগ্রাম দমন করার চেষ্টা করছে। এদেশের বা এদেশে প্রদর্শিত বিদেশী চলচ্চিত্রের শৈল্পিক নৈপুণ্য বা যান্ত্রিক কুশলতা (tech-nic) আমাদের আলোচ্য নয়।

এদেশের চলচ্চিত্রের (এবং এদেশে প্রদর্শিত বিদেশী চলচ্চিত্রেরও) মূল প্রকৃতি নিয়ে বিশ্লেষণ করলে এটা পরিষ্কার হয় যে, মূলতঃ দু'ধরণের প্রচার চালানো হয়—স্থূলপ্রচার ও সূক্ষ্ম প্রচার।

স্থূলপ্রচার : চটুল-প্রেমের কাহিনী, গোয়েন্দা বা গুপ্তচর কাহিনী। সংঘর্ষ, সন্ত্রাস, যৌন-বিকৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষকে, বিশেষভাবে তরুণদের বাস্তববিমুখ করাই হচ্ছে এগুলির মূল উদ্দেশ্য।

অনেক চলচ্চিত্রে আবার দেশপ্রেমের নামে চীন-বিরোধী মনোভাব তৈরী করা হয় যাতে মানুষ তার বাস্তব সমস্যার কথা ভুলে যায়। শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে না তুলে তাদের প্রতি, দেশপ্রেমের নামে, জনগণ যাতে সহ-যোগিতার হাত বাড়ায় নিজেদের ওপর শোষকশ্রেণীর অবাধ লুণ্ঠনকেই বাড়িয়ে তুলতে।

সূক্ষ্মপ্রচার : আর এক ধরণের প্রচার আছে যা আগের ধরণের মত খোলাখুলি কিছু প্রচার করে না। কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে কৌশলে বিষাক্ত চিন্তা ঢুকিয়ে দেয় যাতে তারা বাস্তববিমুখ হয়।

এই ধরণের প্রচারে বিভিন্ন প্রকার কাহিনী প্রাধান্য লাভ করে। এবং

কুশলী পরিচালকেরা এইসব ছবি করে থাকে যারমধ্যে প্রচুর শিল্পগুণও থাকে। এই ধরণের ছবির প্রচার মানুষের মনে অনেকদিন প্রভাব ফেলে রাখে এবং এই কারণেই এগুলি আরও মারাত্মক। এই বিভাগে প্রধানতঃ এই বিষয়গুলিকে রাখা হয়—জমিদার বা ধনিকদের অত্যাচারী জীবনকে তুলে ধরেও সুকৌশলে তাদের নিঃসঙ্গতাকে তুলে ধরা হয় এমনভাবে যে তাদের প্রতি দর্শকদের সহানুভূতি জেগে ওঠে। কখনও জমিদার বা পুঁজিপতিদের খুব দয়ালু দেখান হয়। উদ্দেশ্য ঐ একই। আবার কখনো শ্রমিক-মালিকের ভ্রাতৃভাব দেখান হয়। আবার ধনী মানুষের ধনের জন্যই যে কত দুশ্চিন্তা তাও দেখান হয়। কোন কোন ছবিতে জীবনের দুঃখ দুর্দশা লাঘবে অতিলৌকিক শক্তির যোগাযোগ ইত্যাদি ভাববাদী চিন্তাধারা প্রচার করা হয়। আবার কোন ছবিতে বাস্তব-জীবনের সমস্যার কিছু কিছু তুলে ধরেও তা দূর করার সঠিক পথের নির্দেশ না দিয়ে দর্শকদের মনে হতাশার সৃষ্টি করা হয়।

বর্তমানে আরেক ধরণের ছবি বিশেষ প্রচার লাভ করছে বিশেষতঃ তরুণদের কাছে, তা হ'ল কৈশোর-প্রেমের অমল মধুর কাহিনী। সাম্প্রতিক-কালে বাংলা চলচ্চিত্রে 'বালিকা বধূ' 'ছুটি' 'নতুনপাতা' 'আঁধারসূর্য' ইত্যাদি ছবি তৈরীর দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। এই ছবিগুলি সুকৌশলে তরুণমনকে বাস্তবসমস্যা থেকে এক কাল্পনিক রোমান্টিক জগতে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। শোষিতশ্রেণীর তরুণকে বেঁচে থাকার জন্য যে সংগ্রাম করতে হবে সে চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা এই ছবিগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য। বর্তমান সমাজের সংকট দিন দিন বেড়েই চলেছে। আজকের তরুণের সামনে শিক্ষার দ্বার ক্রমশঃ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং যারা কোনমতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী অতিক্রম করছে তাদেরও বেকারীর খাতায় নাম লেখাতে হচ্ছে। স্বভাবতঃই তার ফলে বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থা পাল্টিয়ে নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা তরুণদের অগ্রণী সচেতন অংশ চিন্তা করছে। শুধু চিন্তাই নয় সক্রিয় প্রচেষ্টাও চালাচ্ছে। তাই শোষকশ্রেণীর আতঙ্কও দিন দিন বাড়ছে। তাই এইপথে চিন্তা ও চেতনার বিকাশ রুদ্ধ করার জন্যই তৈরী হচ্ছে কিশোর-প্রেমের কাহিনীর রোমান্টিক ছবি।

কিন্তু তা করেও শাসকশ্রেণী ক্ষান্ত থাকতে পারছে না। কারণ বর্তমান

সমাজব্যবস্থার যে সংকট পুঞ্জীভূত হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন আশাই আর তার নেই। তাই মরিয়া শোষকশ্রেণী অন্যধরণের কাহিনীকেও আশ্রয় করছে। বর্তমান সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে, সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে তরুণরা। তারা যাতে সমাজবিপ্লবের সঠিক পথে চলতে না পারে তার জন্য চলছে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা। 'বাঘিনী', 'আপনজন', 'তিনভুবনের পারে' এই ধরণের প্রচেষ্টার ইঙ্গিত।

'বাঘিনী' ছবির নায়ক বর্তমান সমাজের মধ্যবিত্ত পরিবারের যুবক। সে চোলাই-মদ পাচারের পাণ্ডা। ছবিতে দেখান হচ্ছে এই যুবক নাকি একদা প্রগতিশীল রাজনীতির সক্রিয় প্রচারক কর্মী ছিল! তার ঘরে মার্ক্স্ এঙ্গেল্স্, লেনিনের বই-ও দেখান হ'ল! সে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু এই সমাজ তাকে বাঁচতে দেয়নি। কাজেই বাঁচার জন্যই তাকে চোলাই মদের গোপন ব্যবসা ধরতে হয়েছে—এই হচ্ছে ছবিটির মূল বক্তব্য। নিপীড়িত মানুষের বাঁচার পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে কারা তা সুকৌশলে চেপে যাওয়া হয়েছে। শোষক শ্রেণীর দ্বারা সাধারণ মানুষের জীবনে চাপিয়ে দেওয়া চরম দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্তি পেতে হলে যে শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে সমাজবিপ্লব সম্পন্ন ও জনগণের-রাজ প্রতিষ্ঠা করা একমাত্র পথ তা চেপে যাওয়া হয়েছে।

এই একই ভাবধারার ফসল 'আপনজন'। এই ছবির বিজ্ঞাপনে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হয়েছিল 'বর্তমান যুগের ছন্নছাড়া ছেলেদের' কাহিনী। এই ছবিতে দেখান হয়েছে এই সমাজব্যবস্থায় হতাশার বলি একদল তরুণকে যারা ব্যক্তিগত জীবনে উচ্ছৃঙ্খল, অবিনীত; যাদের প্রচলিত নাম 'মস্তান'। যারা কোন কারণ ছাড়াই (?) নাকি কলেজে ঘেরাও ধর্মঘট করে—বেঞ্চি টেবিল ভাঙে। এবং নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরে। এখানেও সুকৌশলে অনেককিছুই চেপে যাওয়া হয়েছে। চেপে যাওয়া হয়েছে কোন্ সমাজব্যবস্থার অবধারিত ফল হিসাবে দেখা দিচ্ছে হতাশা। এইসব তরুণ ছাত্রদের সামনে ভবিষ্যৎ জীবনের দরজা বন্ধ—অথচ শোষকশ্রেণী নিজেদের মুনাফার ভাণ্ডার ঠিকই পূর্ণ করছে। ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থা যত ভেঙ্গে পড়ছে, সংকটের জালে যত তারা জড়িয়ে পড়ছে, তত বাড়ছে নিপীড়িত শ্রেণীর ওপর শোষণের বোঝা। তাদের ওপর চেপে বসছে অনাহার দারিদ্র্য বেকারীর পাহাড়। কোন 'দিদিমা'

বা 'ঠাকুমা' ইত্যাদি আপনজনের স্নেহ-মমতা-ভালবাসা এর থেকে মুক্তি দিতে পারে না। হতাশার ভ্রান্ত-পথে ঘুরিয়ে মুক্তির সঠিক পথের নিশানা আড়াল রাখাই এই ছবির একমাত্র লক্ষ্য।

'তিনভুবনের পারে'ও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানেও উপজীব্য ঐ 'মস্তান' ছেলেরা। এদের মধ্যে একজন কেমন ক'রে তার শিক্ষিতা প্রেমিকার প্রেরণায় উচ্চশিক্ষিত হ'ল এবং পূর্বজীবনের দুঃখ দুর্দশা ও হতাশা থেকে মুক্তি পেল তা দেখান হয়েছে। নায়কের ভাই হতাশায় আত্মহত্যা করে। নায়কের মুখ দিয়ে এই প্রসঙ্গে বলান হোল : আমি জানতাম ও' এমনিভাবেই মরবে। (অর্থাৎ, মুক্তি পেতে হ'লে হয় প্রেম কর অথবা মর।)।

এছাড়া আর একধরণের ছবি আছে যাতে শ্রেণীসমন্বয়ের তত্ত্ব প্রচার করা হয়। 'উদয়ের পথে', সূর্যতোরণ, আকাশ পাতাল, মোহাব্বৎ জিন্দগী হ্যায় আসলী নকলী, বালুচরী, সাবরমতী ইত্যাদি।

শ্রমিকের শ্রেণীশত্রু মালিকশ্রেণী। শ্রমিককে শোষণ করেই হয় মালিকদের মুনাফার পাহাড়। উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানাকে ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে যে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক তার প্রকৃতি দ্বন্দ্বাত্মক এবং তা শত্রুতামূলক। কিন্তু শ্রমিকের সঙ্গে মালিকের সম্পর্ককে সমন্বয় ক'রে শ্রমিকের শ্রেণীচেতনা ভোঁতা করে দেওয়ার চেষ্টা শাসকশ্রেণী আরম্ভ করেছে অনেকদিন ধরেই।

বহুদিন আগেকার ছবি 'উদয়ের পথে' থেকেই এইপথে প্রচার আরম্ভ হয়। এই ছবিতে শ্রমিকের ওপর মালিকের অত্যাচারও দেখান হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মালিকের মেয়ে শ্রমিকনেতাকে বিয়ে করল—মালিকের আনুকূল্যেই।

'আকাশ পাতাল' ছবিতেও মালিক-শ্রমিক সংঘর্ষ দেখান হয়েছে এক জায়গায়। এই ছবিরও পরিণতি শ্রমিকের মেয়ের সঙ্গে মালিকের ছেলের গভীর প্রেমে। 'মোহাব্বৎ জিন্দগী হ্যায়' ছবিতেও দেখান হয়েছে খনি মালিকের মেয়ের সঙ্গে সাধারণ শ্রমিকের প্রেম ও বিবাহ। এই ছবিতে আবার সুচতুরভাবে শ্রমিকজীবনকে এমনভাবে দেখান হয়েছে যাতে মনে হবে শ্রমিকের কোন দারিদ্র্য নেই—তাদের জীবনে প্রেম ভিন্ন অন্য কোন সমস্যাই নেই।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে 'কালামাটি' নামে বাংলা চলচ্চিত্রের কথা।

সেখানে দেখান হয়েছে কয়লাখনির মালিকপক্ষ শ্রমিকের মঙ্গলের (?) জন্য কত আন্তরিক! তারা শ্রমিকদের ছেলেমেয়েদের জন্য নার্সারী খুলতে চায়। অথচ 'অজ্ঞ', 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' শ্রমিকরাই তাতে বাধা দিচ্ছে। এইভাবে মালিকশ্রেণীর প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর সহানুভূতি বাড়াবার চেষ্টা করা হয়েছে।

'সাবরমতী' ছবিতে দেখান হচ্ছে—কয়েকটি কাপড় কলের এক জাঁদরেল মালিকের মেয়ে বাপের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে পথে বেরোয়। পথের আলাপে এক মধ্যবিত্ত যুবকের প্রেমে পড়ে এবং তার বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। পরে যুবকটি মেয়েটির সব পরিচয় পেয়ে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসে এবং কোন কারণে ঐ মালিকের লাঞ্ছনা ভোগ করে। এই লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে ঐ তরুণটি কেমন ক'রে যেন নিজের চেষ্টায় (?) কাপড়-কলের মালিকে পরিণত হয়। তখন পূর্বোক্ত মিল-মালিক পরাজয় স্বীকার করে এবং ঐ তরুণটির সঙ্গে নিজের মেয়ের বিবাহে সম্মতি দেয়। এখানেও শ্রেণী সমন্বয়ের তত্ত্ব প্রচার ক'রে শ্রমিক-মধ্যবিত্তের শ্রেণীচেতনা বিপথে চালিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

তিন অধ্যায়, বালুচরী, বৌদি প্রভৃতি ছবিতেও সুকৌশলে মালিক-কর্মচারীর 'মধুর সম্পর্ক' দেখান হয়েছে। 'বালুচরী'তে মালিকের আধুনিকা মেয়ের সঙ্গে মধ্যবিত্ত সাধারণ কর্মচারীর বিবাহ এবং তার থেকে উদ্ভূত মানসিক অশান্তি সংঘাত এবং পরিশেষে মিলন উপজীব্য করা হয়েছে।

একদা প্রগতিশীল বলে পরিচিত পরিচালক সত্যজিৎ রায় 'পথের পাঁচালী' দিয়ে ছবি তোলা শুরু করেন। 'জলসাঘরে' তাঁর স্বরূপটি খুলে যায়। সেখানে তিনি জমিদারের একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা, সঙ্গীত-প্রীতি ইত্যাদি দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলে সামন্ত জমিদারের প্রতি জনগণের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। মানুষের দৃষ্টিকে পেছন দিকে টেনে রাখতে চেয়েছেন।

'নায়কে'র মধ্যেও একই প্রয়াস সুস্পষ্ট। অর্থবান হলেই যে মানুষ সুখী হয় না এই বক্তব্য তাঁর আগের ছবি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র মত এই ছবিতেও রাখা হয়েছে। আবার এরই সাথে সাথে এক জায়গায় শ্রমিক ও শ্রমিক-আন্দোলন সম্পর্কে কটূক্তি করা হয়েছে। যে শিল্পী শ্রমিক সম্পর্কে ও শ্রমিকনেতার সংগ্রামী বক্তব্যকে বাঁকাভাবে উপহাস করে, তার শ্রেণী-অবস্থান বুঝতে কারো বাকী থাকে

না। তাই তার প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা শোষকশ্রেণীরই হাত শক্ত করার নামান্তর।

শ্রীরায় তারপর হঠাৎ-ই যেন আবিষ্কার করেছেন এদেশে মানুষের জীবনে আর কোন সমস্যাই নেই, কেবল রহস্য উদ্ঘাটনের সমস্যা ছাড়া। তার এই বজ্জাতির ব্যর্থ প্রয়াস 'চিড়িয়াখানা' ছবি। সাধারণ মানুষের জীবনে আজ যে সংকটের পর সংকট নেমে আসছে, তার থেকে দৃষ্টি ফেরানোর জন্যই হলিউডে ও পশ্চিম ইউরোপে গোয়েন্দা বা স্পাই পিক্চার তোলা হয়। শ্রীরায় তাদের প্রচেষ্টায় মদৎ দিয়েছেন 'বাঙালী গোয়েন্দা কাহিনী'কে চিত্রায়িত ক'রে।

শ্রীরায় তাঁর এই প্রচেষ্টার পথে আরো একধাপ এগিয়ে এসেছেন তাঁর সাম্প্রতিকতম ছবি 'গু-গা-বা-বা'তে। এবারে আর বাস্তবজীবনই নয়। কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে দর্শকদের রূপকথার জগতে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। সেখানে ভূতের বরে কত অলৌকিক কাণ্ডই না ঘটছে !! নায়ক-দ্বয়ের খাওয়া-পরার কোন অভাবই থাকছে না! তালি দিলেই রাজকীয় খাদ্য ও রাজপোষাক চ'লে আসছে। [এই ছবির একটা গানে আছে : "দুঃখ কীসে হয়? অভাগার অভাবে জেনো শুধু নয় / যার ভাণ্ডারে রাশিরাশি / সোনাদানা ঠাসাঠাসি। তার-ও ভয় / জেনো সেও সুখী নয়।"—অর্থাৎ টাকা থাকলেই মানুষ সুখী হয় না এই বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।]

শ্রীরায়ের ছবিতে শিল্পগুণ যথেষ্ট থাকে এবং তাঁর দর্শকমহলে খ্যাতিও আছে। তাই শোষকশ্রেণী এমন পরিচালককেই বেছে নিয়েছে তাদের বক্তব্যকে তুলে ধরার জন্য। শ্রীরায় বর্তমানে যে ছবি তুলছেন, শোনা যাচ্ছে, তা একটি অশ্লীল নগ্ন ছবি।

ছবিতে অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা ঘটানোর চেষ্টা অবশ্য এই প্রথম নয়। বরং আরো সূক্ষ্মভাবে বাস্তবজীবনের মধ্যেই অলৌকিক শক্তির জয়গান করা হয়েছে (তপন সিংহের) 'গল্প হলেও সত্যি' এবং হিন্দীছবি 'গাইডে'।

আজকের মানুষ বাঁচার লড়াই-এর প্রতিপদেই বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। নানান অর্থনৈতিক সমস্যায় তার জীবন জর্জরিত। ফলে আজকের সমাজে এসেছে ভাঙন। একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের মূলেও তাই আছে সামাজিক অর্থনৈতিক কারণ। 'গল্প হলেও সত্যি' ছবিতে দেখান হ'ল ওসব কিছু নয়, আসলে

হাসিমুখে ভালভাবে ব্যবহার করলেই একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন রোধ করা যায়। কোথাকার এক 'অলৌকিক' চাকর এসে মিষ্টি ব্যবহার ক'রে চাঁদের ভাঙা হাট আবার জোড়া দিল। পরিবারের কর্তা-গিন্নীদের মধ্যে আবার পারস্পরিক সৌহার্দ্য প্রীতির সম্পর্ক ফিরে এল।

'গাইডে'র বক্তব্য আরো মারাত্মক। এই সমাজব্যবস্থার জন্যই আমাদের দেশের চাষাবাদের সামন্ততান্ত্রিক প্রথাকে ধ'রে রাখা হয়। কারণ তা বজায় রাখতে পারলেই এদেশের উপর বিদেশী প্রভুর কব্জা দৃঢ় থাকবে। বিদেশের ওপর খাদ্যের জন্য নির্ভরতা বাড়বে—দেশের জনগণের বৃহত্তম অংশ কৃষকরা দিনের পর দিন নিঃস্ব হবে—তাদের ক্রয়-ক্ষমতা কমবে। ফলে দেশীয় শিল্প বাজার হারাবে ও তার বিকাশ রুদ্ধ হবে। কিন্তু শোষক শ্রেণী কর্তৃক এই ধারণা চালু করা হয় যদি দেবতা দয়া করেন তবেই ফসল ফলবে, মানুষ বাঁচবে। সেজন্য এই ছবিতে দেখি তীব্র খরার সময় এক সাধুর দিন কয়েকের অনশনে (গান্ধীর অনশন সত্যাগ্রহের তত্ত্ব?) জল নেমে এল দেবতার কৃপায়। এবং জনগণ তার জয়গানে হ'ল মুখর। এইভাবে অলৌকিকতাবাদ ও দেব-নির্ভরতাকে প্রচার করা হয়েছে 'গাইড' ছবিতে।

এই রকম আরো বহু ছবি আছে ; দৃষ্টান্ত আর বাড়াব না। এইসব ছবিতে খুব সূক্ষ্মভাবে শাসকশ্রেণীর অনুকূল ধ্যান ধারণা প্রচার করা হয়। সরাসরি কিছুই বলা হয় না। দর্শকরা ভাবেন, তাঁরা একটা "নির্মল সুন্দর" ছবি দেখছেন। কেমন নিঃশব্দে ক্রমশঃ জনবিরোধী ধ্যানধারণা তাঁদের মনে সংক্রামিত হচ্ছে, তা তাঁরা টেরও পান না। কাজেই এইসব ছবিতে রাজনীতি (শাসকশ্রেণীর রাজনীতি (প্রচার করা হচ্ছে বললে কিছু লোক ক্ষেপে ওঠেন। কিন্তু ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা করলে এটা তাঁদের কাছেও স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। ওপরের আলোচনায় তাঁদের চিন্তার কিছু খোরাক দেওয়া হয়েছে।

এবার স্থূল প্রচার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। কুরুচিপূর্ণ নগ্ন ছবিতে ত আজকাল শহর ছেয়ে গেছে। বোম্বাই ও হলিউড মার্কা ছবিই এক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পায়। Casanova-70, Night around the World, Women by Night ইত্যাদি মাত্র কয়েকটির নাম। আরও নিদর্শন দেওয়া যায়। হিন্দী ছবির কোনটার বিশেষ উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু

বাংলা ছবিতেও, ধীরে হলেও, এদিকে পদক্ষেপ শুরু হয়েছে। 'শুধু একটি বছর'-এর একটি দৃশ্য, 'বাঘিনী'র কয়েকটি দৃশ্য, 'উল্কা', 'চৌরঙ্গী' মনিহারে'র ক্যাবারে নাচ উল্লেখযোগ্য। অর্ধনগ্ন নারীদেহের বিশেষ বিশেষ স্থানে ক্যামেরা ফোকাস ক'রে দর্শকদের, বিশেষ ক'রে তরুণদের যৌন-উত্তেজনার খোরাক দেওয়া হয়। তরুণদের সমাজচেতনা ভোঁতা ক'রে দেওয়াই এইসব ছবির মূল লক্ষ্য।

স্পাই বা এজেন্ট পিক্‌চার, ডাকাতি বা গোয়েন্দা কাহিনীর ছবিরও মূলউদ্দেশ্য তাই। রোমহর্ষক ঘটনা, খুন-জখম, সংঘর্ষ-সন্ত্রাস, সেই সঙ্গে প্রায়-নগ্ন নারীদেহের ছবি ও টুইষ্টনাচের মিশ্রণ দিয়ে যুবমনকে উত্তেজিত ক'রে গভীর চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই এইসব ছবির বহুল প্রচার করা হয় 'A'-মার্কা লাগিয়ে।

ভারতের শাসকশ্রেণীর মহা সুবিধে শোষিত মানুষের বিক্ষোভ দমন করার। দুই সীমান্তে তার নাকি দুই শত্রু ওঁৎ পেতে আছে—ঝাঁপিয়ে পড়বে ব'লে! জনগণ যদি প্রশ্ন করে, খাদ্য-বস্ত্র নেই কেন? উত্তর হবে—চীন। বেকারী দারিদ্র্য ছাঁটাই বাড়ছে কেন? উত্তর সেই একই—চীন। তাই জনগণের চীন-বিরোধী মনোভাব গ'ড়ে তোলার দিকে শাসকশ্রেণী বিশেষ ভাবে নজর দিয়েছে। এ বিষয়ে শুধু সিনেমাই নয়, প্রচারের অন্যান্য হাতিয়ারগুলোও (রেডিও, কাগজ ইত্যাদি) সর্বদা সরব। এমন কোন দিন বোধহয় যায় না যে দিন কাগজ বা রেডিওতে সমাজতান্ত্রিক চীনের নামে কুৎসা করা না হয়। 'হংকং-এ আগত জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী'র জবানীতে এই মর্মে সংবাদ সেদিনও বেরিয়েছে যে, চীনের শহরের রাস্তায় রাস্তায় নাকি ড্রামে ক'রে "মানুষ সেদ্ধ" করা হচ্ছে!! [অপপ্রচারেরও একটা মাত্রা থাকা দরকার—এরা প্রচারের আনন্দে তাও ভুলে যায় মাঝে মাঝে।] কাজেই সিনেমাই বা এ বিষয়ে পেছিয়ে থাকে কেন! এদিকে প্রচার-অভিযান অনেক আগেই শুরু হ'য়েছে। সেই 'সন্ধ্যাদীপের শিখা', 'হকিকৎ থেকে 'শতরঞ্জ', 'হামসায়া' 'কিসমৎ', প্রভৃতি ছবি পর্যন্ত।

'সন্ধ্যাদীপের শিখায়' ভারত-চীন সীমান্ত-সংঘর্ষের কাহিনীকে কেন্দ্র করে দর্শক সাধারণের 'দেশপ্রেমের দীপশিখা'কে খুঁচিয়ে বাড়াবার চেষ্টা হয়েছে। নায়িকার স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয় এবং তার মৃত্যুস্থানটি আবার থাকে চীনা-

সৈন্যের দখলে। তাই শোকাতুরা নায়িকা (যে ব্যক্তিগত জীবনে মদ্যপ, অসংযতা) স্বামীর মৃত্যুস্থানের দিকে ছুটল—কিন্তু মাঝপথেই 'বীভৎসদর্শন' (?) চীনাসৈন্যের হাতে তার মৃত্যু ঘটল। এমনভাবে দৃশ্যটি উপস্থাপিত করা হ'ল যাতে দর্শকদের মনে ঘৃণা জাগে চীনা সৈনিকের প্রতি।

'হকিকতে'র কাহিনীর বিষয়বস্তুও সেই একই। চীনাসৈনিকেরা নাকি ভারতভূমি দখলের জন্য (?) এগিয়ে আসছে····ভারতীয় সৈন্যরা বাধা দিচ্ছে না। অবশেষে দর্শকদের উৎকণ্ঠা চরমে তুলে ভারতের সেনাপতি গুলির আদেশ দিলেন এবং চীনাদের খতম করলেন !

শুধু যে চীন-ভারত সীমান্ত-সংঘর্ষের পটভূমিকায় ছবি তৈরী ক'রে জনগণকে 'দেশপ্রেমের ইন্‌জেক্‌শন' দেওয়া হয় তা নয় ; অন্য কাহিনীর ছবিতেও কারণে অকারণে চীনের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হয়। প্রসঙ্গক্রমে, 'গোয়া' ছবির নাম করা যায়। এই ছবির বিষয়বস্তু যদিও গোয়া দখলের কাহিনী তবু এতে এক জায়গায় একটি গানে আছে [ধান ভান্‌তে শিবের গীতের মত (?)]—'কই নহি রহেগা···চাও-মাও কই নহি রহেগা !' দর্শকমনে সূক্ষ্মভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল যেন চৌ-এন-লাই এবং মাও-সেতুঙ্‌ ভারত দখল ক'রে আছে এবং তাদের বিতাড়িত করা হ'বে। এখানে আবার কালো কাপড়ে চোখ ঢাকা চৌ-এন-লাইকেও (?) দেখানো হল !

'হামসায়া' ছবিতেও একই প্রচার। ভারতীয় সৈনিকের হাতে চীনা গণমুক্তি ফৌজের সৈনিকেরা কী প্রচণ্ড মারটাই (?) না খেল !—তা দেখিয়ে দর্শকদের দেশপ্রেম জাগ্রত করার ব্যর্থ চেষ্টা করা হ'য়েছে।

'শতরঞ্জ' ছবির কাহিনী আবার একটু ঘোরালো। এক ভারতীয়া নর্তকীকে নাকি চীনারা আটক ক'রে রেখেছে ! তার উদ্ধারের কাহিনীই এর বিষয়বস্তু। এখানে 'লিন' নামে একজন চীনা সেনাবাহিনীর প্রধানকে দেখান হ'ল, যে নাকি বন্দুকের জোরে চীনা সৈনিকদের তাঁবে রেখেছে—যার গতিবিধি সর্বদা রহস্যাবৃত (এর মুখ আবার পর্দায় অদৃশ্য থাকছে)। ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট। চীনা গণফৌজের প্রধান, ভাইস-চেয়ারম্যান লিন-পিয়াও-কে কৌশলে দেখানো হ'ল অত্যাচারী ব'লে। তিনি নাকি বন্দুকের জোরে রাজত্ব করছেন !

এই পর্যায়ে 'কিসমৎ', 'অঞ্জাম' প্রভৃতি ছবিতেও চীন বিরোধী বক্তব্য রাখা হয়েছে।

কিন্তু কেন এই চীন-বিরোধী অপপ্রচার?—আজ সমাজতান্ত্রিক চীন বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের আদর্শস্থল। সমস্ত বাধা-বিপত্তি তুচ্ছ ক'রে চীনের জনগণ এগিয়ে চলেছেন চেয়ারম্যান মাও-সেতুঙের নেতৃত্বে—শোষণহীন শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে। মাও-সেতুঙের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার ক'রে বিশ্বের শোষিত মানুষ মুক্তিসংগ্রাম গ'ড়ে তুলছে দিকে দিকে। তাই বিশ্বের শোষকশ্রেণীর এত ভয়, এত আতঙ্ক! তাই প্রাণপণে কুৎসা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে মহান চীনের বিরুদ্ধে যাতে শোষিত জনগণের মনে চীনের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব জাগে ঠিক—যেমন ঠাকুরমা-দিদিমারা অন্ধকারের দিকে আঙুল দেখিয়ে, ভূত-পেত্নী-রাক্ষস-দৈত্যের গল্প ব'লে শিশুর মনে ভয় ঢুকিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করে।

ভারতের শোষকশ্রেণীও সেই বিশ্বব্যাপী চক্রান্তে সামিল হয়েছে। তাদের আবার আর একটা উদ্দেশ্যও আছে। চীন-বিরোধী মনোভাব জিইয়ে রেখে যুদ্ধ-অর্থনীতি চালু ক'রে তারা তাদের সংকট থেকে রেহাই পেতে চাচ্ছে। আর বছর বছর যুদ্ধ বাজেট বাড়ানো হচ্ছে জনগণের ওপর ট্যাক্স বসিয়ে। তাই শোষকশ্রেণীর এই ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুধু নয়, এর সক্রিয় প্রতিরোধ করাও শোষিতশ্রেণীর জনগণের কর্তব্য।

আমরা আগেই বলেছি, সংস্কৃতি হ'ল কোন নির্দিষ্ট সমাজের রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রতিচ্ছবি। কোন সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তিত হ'লে তার উপরি-কাঠামো সংস্কৃতিতেও পরিবর্তন আসে। কাজেই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যে সংস্কৃতি গ'ড়ে ওঠে, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সেই সংস্কৃতি থাকতে পারে না—তার আমূল পরিবর্তন হয়। আমরা জানি ১৯১৭-র অক্টোবরে রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী মহান লেনিনের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে এবং ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা উচ্ছেদ ক'রে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। পরে স্তালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভ প্রমুখ শোধনবাদীচক্র [যারা মুখে মার্কস্‌বাদ অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর দর্শনের কথা বলে কিন্তু কাজে ধনিকশ্রেণীর দর্শন ও ধনতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করে তারা শোধনবাদী] ক্ষমতায় আসে এবং ধীরে ধীরে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে পিছু হটে পুনরায় ধনতান্ত্রিক

সমাজব্যবস্থা (সাময়িকভাবে) কায়েম ক'রেছে। সমাজ কাঠামোর এই পরিবর্তনের ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে সেখানে সংস্কৃতিও পরিবর্তিত হ'য়ে গেছে। অর্থাৎ সাংস্কৃতিকক্ষেত্রেও আমরা শোষকশ্রেণীর সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন দেখতে পাচ্ছি। তাই আজ রাশিয়ার শহরে শহরে নাইটক্লাব, বার ক্যাবারে-গুলো পুনরায় জম-জমাট হ'য়ে উঠেছে। সাহিত্য পত্রিকায় (স্পুৎনিক প্রভৃতি) অর্ধনগ্ন নারীদেহের ছবি প্রকাশিত হচ্ছে। কাজেই সিনেমাই বা বাদ যায় কেন! এর জাজ্বল্যমান উদাহরণ কিছুদিন আগে কোলকাতায় প্রদর্শিত রুশ ছবি 'The fight under water', যা যে কোন হলিউডী ছবিকে টেক্কা দিতে পারে। আমাদের যে সব বন্ধুরা আজো রাশিয়াকে 'সমাজতান্ত্রিক দেশ' বলতেগদগদ হন তাঁদের অনুরোধ করছি ঐ ছবিটি একটু কষ্ট ক'রে দেখে আসতে।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি চলচ্চিত্রকে কিভাবে শোষকশ্রেণী এই শোষণ-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা-রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার কারছে জনচিত্তে চলচ্চিত্রের একটা গভীর প্রভাব আছে—আর তাকেই শোষকশ্রেণী তার শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখতে কাজে লাগায়। তাই বর্তমান চলচ্চিত্রের এত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে যাতে আরও নিখুঁতভাবে এই চলচ্চিত্র বর্তমান সমাজব্যবস্থা রক্ষার ভূমিকা পালন করতে পারে। কাজেই শোষিতশ্রেণীর সচেতন অংশের বিশেষভাবে যুব-ছাত্রের ওপর আজ দায়িত্ব এসে পড়েছে এইসব চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে প্রচার-অভিযান চালানোর এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এর প্রতিরোধে সামিল হবার !!

১। K. Marx, "preface to a Contribution to the Critique of Political Economy", *Collected Works*—Marx & Engels F. L. P. H, Moscow, 1958, Vol. I, p. 363.

২। ঐ

৩। মাও সেতুঙ্, 'নয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গে', দেশব্রতী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা—২.

মাওসেতুঙ্‌এর
চিন্তাধারায়

ভারতের জনগণ
এগিয়ে চলেছে

শত্রু তার অস্ত্রে শান দিচ্ছে—
আমরা, জনগণ, শান দিই
আমাদের অস্ত্রে।

স্বপ্ন ও সংগ্রাম : অতীত ও আগামী বাংলাসাহিত্য

উৎপল রাহা
দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা

জন্মলগ্নের সূচনাকাল থেকেই মানব সমাজ তথা মানবসভ্যতার ক্রম-পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের সূত্র সন্ধানের প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে ভাববাদী দার্শনিকের দল তাঁদের পান পাত্রে প্রচুর তুফান তুলেছেন ও তুলবেন। কিন্তু শতচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁদের সর্বপ্রকার মনগড়া তত্ত্ব এবং ধ্যান ধারণা আর কোন দিনই তাঁরা পৃথিবীর মানুষের মগজে জোর করে পুরে দিতে পারবেন না। কারণ ১৮৪৮ সালে রচিত "Manifesto of the Communist Party" গ্রন্থের প্রথম অনুচ্ছেদে প্রচলিত সমস্ত ভাববাদী চিন্তা এবং মতবাদের ভিত্তিকে নস্যাৎ করে দিয়ে Karl Marx এবং Frederick Engels মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—
"The history of all hitherto existing society is the history of class struggles. Freeman and slave, patrician and plebeian, lord and serf, guild-master and journeyman, in a word oppressor and opressed, stood in constant opposition to one another, carried on an uninterrupted, now hidden, now open fight, a fight that each time ended, either in a revolutionary reconsitution of society at large, or in the common ruin of the contending classes."

একথা আজ দ্বিধাবিমুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি আমরা যে, কোন বস্তুর গতির পিছনে কাজ করে তার অন্তর্নিহিত দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ ও ঐক্য। এরই নাম দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি শুধুমাত্র

কোন বিশেষ বস্তুর ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র সমাজের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। তাহলে স্বভাবতঃই সমাজের অভ্যন্তরেও দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তির সংঘ বিদ্যমান—একথা মানতে হয়। এই শক্তি দুটি কি? এ দুটি হ'ল মানুষ (অর্থাৎ যে মূল উৎপাদিকা শক্তি) এবং উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা। আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে যাত্রা শুরু করে এই দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ দাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করে এবং পরিশেষে এই দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তি সমাজতান্ত্রিক সমাজে ঐক্য প্রাপ্ত হয়। সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাস মূলতঃ এই দুই বিপরীত শক্তির সংঘর্ষের ইতিহাস। স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে—সাহিত্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি থাকতে পারে? ভাববাদী বিদ্বান বিদগ্ধ সাহিত্যকার তো তাঁর মতামত খোলাখুলিই প্রচার করেছেন—'Art for Art's sake', অর্থাৎ শিল্প তো কেবলমাত্র শিল্পকে নিয়েই—তার মধ্যে কোন মতবাদ কোনক্রমেই স্থান লাভ করতে পারে না। সাহিত্য হ'ল স্বাধীন, তা কখনোই কোনো তত্ত্বকথা প্রচারের বাহন হ'বে না। অন্যথায় 'সাহিত্যরস' নামক বস্তুটি নাকি কর্পূরের মত হাওয়ায় উবে যাবে!

এই ভাববাদী মতবাদটি যে কতখানি নির্লজ্জ ভণ্ডামীর পরিচায়ক, তা' কিন্তু যে কোন দেশের সাহিত্য একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। দেশ, কাল ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, 'সাহিত্য বৃন্তহীন পুষ্প নয়' বরং সাহিত্য 'সমাজের দর্পণ'। এবং যেহেতু মানুষকে নিয়েই সমাজ এবং সেই সমাজের বৃহত্তর অংশ ক্ষুদ্রতর অংশের দ্বারা শোষিত, নিপীড়িত এবং লাঞ্ছিত—অতএব তাদের সেই যন্ত্রণাকাতর মুখের ছাপ সাহিত্যে পড়তে বাধ্য। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, শোষকের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে যখন তারা দুর্বারবেগে সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'য়েছে, তখন তাদের তৎকালীন ঘৃণা ও ক্রোধের প্রতিচ্ছবির নিদর্শন সাহিত্যে অবশ্যই সংগৃহীত। বাংলাসাহিত্যে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রামাণ্য চিত্রের নিদর্শন বিরল। কিন্তু তবুও চর্যাপদের যুগ থেকে শুরু করে রেনেসাঁসের প্রারম্ভ পর্যন্ত বিচার করলে বিভিন্ন উপাখ্যান ও কাহিনীর মধ্যে যে সমাজচিত্র পাওয়া যায় তাতে নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর একটু কান পাতলেই ধরা পড়ে। সাধারণ মানুষের কথা বলতে বাধ্য হ'য়েছেন তৎকালীন সাহিত্যিক, কিন্তু শ্রেণী-চেতনা ও বিদ্রোহের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে সুকৌশলে তাকে ভাগ্যদেবীর কব্জায় ফেলে দেবতার

চরণে নিক্ষেপ করেছেন। সমস্ত দুঃখদারিদ্র্য এবং অভাব অনটনের কারণ হিসাবে দৈবরোষকে দায়ী করার এই কৌশল সুনিশ্চিতভাবেই শোষিত মানবসমাজের ক্রোধাগ্নি থেকে তার শ্রেণীশত্রু শোষক-সম্প্রদায়কে দূরে সরিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু তবুও দেবতার মহিমাকীর্তনের সুর সর্বত্র ক্ষুধিত মানুষের আর্তনাদকে চাপা দিয়ে রাখতে পারেনি, তা সম্ভবও হয় না। চর্যাপদে যখন সেই অভুক্ত মানুষটির কণ্ঠস্বর শুনি ঃ—

"টালত মোর ঘর নাহি পড়িবেষী।
হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী॥

তখনই একথা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে সমাজকে বাদ দিয়ে, শোষিত অনাহারী মানুষকে বাদ দিয়ে ফুলপরীর দেশের রূপকথা রচনা বাস্তবে অসম্ভব। মঙ্গলকাব্যে ফুল্লরার বারমাস্যা প্রসঙ্গেও একই বক্তব্য। যাঁরা বলেন যে, মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যে মানুষের ভূমিকা গৌণ, তাঁদের স্মরণ করতে বলব যে, এই যুগেই প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস গেয়েছেন—

"শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

অতএব বোঝা যায় যে শিল্পী কখনই বস্তু জগৎকে অস্বীকার করতে পারেন না। শ্রেণীদ্বন্দ্বকে অস্বীকার করে, বস্তুবাদের উর্দ্ধে কাল্পনিক আদর্শবাদকে প্রতিষ্ঠিত করে মানবসমাজের ছবি আঁকলে তা হ'য় মিথ্যাচার। শিল্পী জীবন ও যুগচেতনার শরিক হ'বেন এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের বাস্তব রূপটিকে ফুটিয়ে তুলবেন অবিকৃতরূপে তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে—যে সাহিত্যে শ্রেণীশত্রুকে চিনে নিতে একমুহূর্তও দেরী হ'বে না। এই হচ্ছে মার্কসবাদী দৃষ্টিভংগীতে সাহিত্যের সঠিক ব্যাখ্যা। 'শিল্পকলার খাতিরেই শিল্পকলা, শ্রেণীর উর্দ্ধে শিল্পকলা এবং রাজনীতির সঙ্গে সমান্তরাল অথবা পরস্পর স্বাধীন শিল্পকলার বাস্তবে কোন অস্তিত্বই নেই।'

বাংলা সাহিত্যে প্রগতির পদধ্বনি যে কবে প্রথম শোনা গিয়েছিল তা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা কঠিন। সামন্ততান্ত্রিক বাংলাদেশে সংস্কৃতি মৌলিকভাবে বিকশিত হতে পেরেছিল। ভারতবর্ষ বৃটিশ উপনিবেশে পরিণত হওয়ার সাথে সাথে বৃটেনের ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির ঢেউ এসে আঘাত করল দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির

মূলে। কিন্তু যেহেতু সমাজের স্বাভাবিক দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তিত হ'ল না, সেজন্যই নূতন সংস্কৃতির অবস্থা দাঁড়াল ওপর থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বস্তুর মত। এদেশের মাটির সঙ্গে বুর্জোয়া সংস্কৃতির যোগসূত্রটি হ'ল অত্যন্ত ক্ষীণ।

এই পাশ্চাত্য সংস্কৃতি উদারতাবাদের বার্তা নিয়ে এসে হাজির হ'ল বুদ্ধিজীবি বাঙালীর মানস জগতে। স্বাধীন ব্যক্তিত্ববাদের প্রথম (?) উন্মেষ ঘটল চিন্তা রাজ্যে এবং সেই সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রেও। এই বিশেষ যুগটির ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ব্যক্তি হ'লেন রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, ডিরোজিও ইত্যাদি। এঁরা এই নতুন সংস্কৃতির প্রবর্তকের ভূমিকা গ্রহণ করলেন। এঁদের সমাজ ও সাহিত্য আন্দোলন মূলতঃ উপনিবেশবাদী। এঁরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিজের স্বার্থেই তার সমর্থন পুষ্ট। ভারতীয় সমাজের সঙ্গে তাঁদের নাড়ীর যোগ ছিল না। এঁদের চিন্তাধারার স্বরূপ মেকলের সুবিখ্যাত উক্তিতে পরিস্ফুটিত :—
"We must do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern, a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect....."

স্পষ্টই দেখা যায় যে বুর্জোয়া গোষ্ঠীর প্রচারের হাতিয়ার হিসাবেই এঁদের দায়িত্ব এঁরা পালন করেছেন। যদিও বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' ইত্যাদি প্রবন্ধে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ পেয়েছে, রামমোহন বলেছিলেন : "স্থির-বুদ্ধি লোকমাত্রই ভারতের পরাধীনতা ও বিদেশী শাসনের দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন"। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, উপনিবেশবাদের প্রভাবকে অতিক্রম করে তার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধাত্মক আন্দোলনের কথা কেউই চিন্তা করেন নি। জনসাধারণের সঙ্গে এদের সংযোগ ছিল না বললেই চলে। এঁরা একদিকে সামন্ত-তন্ত্রচ্যুত, কিন্তু শ্রেণীচেতনাসম্পন্ন নন, ফলে কোন নির্দিষ্ট সমাধান আবিষ্কারে ব্যর্থ হয়েছেন। ইংরাজী শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত রামমোহন অর্থনৈতিক শোষণকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে মুক্তির রাস্তা খুঁজেছেন বেদান্ত শাস্ত্রের মধ্যে।

পরবর্তী পর্যায়ে দেখি ডিরোজিও-র নেতৃত্বে 'ইয়ংবেংগল' গোষ্ঠী সামাজিক বিধিনিষেধ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। চিন্তাধারার

গণ্ডীবদ্ধতা সত্ত্বেও এঁদের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার ফলেই যুক্তিবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়। অর্থনৈতিক আন্দোলনও সংগঠিত করেছিলেন এঁরা। কিন্তু নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে বেরোতে অক্ষম হওয়ার ফলে তা ব্যর্থ হ'ল। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হ'লেন রামগোপাল ঘোষ, দুর্গা বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিক মল্লিক ইত্যাদি।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই নবজাগরণের প্রভাব অনিবার্যভাবেই পড়েছে,—লক্ষ্য করলেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এই দোদুল্যমানতার যুগেই বাংলা গদ্যের উদ্ভব এবং দ্রুতবিকাশ সম্ভবপর হয়েছিল। বাস্তব জীবন-চেতনার স্পর্শে উজ্জ্বল এ যুগের কাব্য, গদ্য এবং নাট্য-সাহিত্য। কবি ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে দেখি অন্ধ বিদেশপ্রীতির প্রতি ধিক্কার জানাবার সূত্রে স্বদেশ প্রেমের উন্মেষ। বাস্তব জীবনের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন তিনি তাঁর রচনায়। 'দেশের কুকুর ধরি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া'—এই উক্তিতে তৎকালীন ব্রিটিশ-বিরোধী অসন্তোষের সুর ধ্বনিত হ'য়েছে।

এই সময়েই মাইকেল মধুসূদনের কাব্যে এক আশ্চর্য প্রগতিচিন্তা পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণের বা বিকাশলাভের প্রচেষ্টার নিদর্শন পাই 'মেঘনাদবধ' কাব্যে; গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ ঘোষিত হ'ল 'অমিত্রাক্ষর ছন্দের' মাধ্যমে। চিরঘৃণিত রাক্ষস রাবণ তাঁর দৃষ্টিতে "....was a grand fellow", দেবত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মুখর। মানুষের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করেন কবি একান্তভাবেই। সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনায়ও তিনি বিন্দুমাত্র সত্যগোপনের চেষ্টা করেন নি—'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা'-য় তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বিরাজমান।

এ কালের নাট্য-সাহিত্যেও মানুষের জীবনচেতনা, তথা বাস্তবচেতনার বিকাশের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কালীপ্রসন্ন সিংহ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, উমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতির নাটকে সমকালীন সমাজ সম্বন্ধে বক্তব্য লক্ষ্য করার বিষয়। গদ্যরচনার ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে প্রচলিত গদ্যরীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং বিষয়গত বৈচিত্র্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই যুগেই আমরা লক্ষ্য করি এক সুদৃঢ় সঙ্কল্পের প্রতিমূর্তিস্বরূপ লৌহমানব বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। সমস্ত রকম প্রচলিত সামাজিক কু-সংস্কার ও

আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁর সুতীব্র কশাঘাত সহ্য করতে পারল না তৎকালীন সমাজকর্তাবৃন্দ। সতীদাহ প্রথা, কৌলীন্য প্রথা, বালবিবাহ এবং বিধবা প্রথা—সমস্ত সামন্তযুগীয় সংস্কারকে চুরমার করে দিলেন তিনি। 'বোধোদয়' গ্রন্থে তাঁর ধর্মচিন্তা পরিস্ফুটিত। পাশ্চাত্য যান্ত্রিক জড়বাদের প্রভাব বিদ্যাসাগরের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি' নামক গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলাসাহিত্যে প্রথম শৈল্পিক-গদ্য ব্যবহারের অনুপম দৃষ্টান্ত একমাত্র তিনিই দেখাতে পেরেছেন।

এরপর ১৮৫৭ সাল ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। সিপাহী বিদ্রোহের রণডঙ্কা বেজে উঠেছিল সারা দেশ জুড়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণায়, বিদ্বেষে ভরে উঠেছিল সমস্ত ভারতীয় জনতার মন। ঝাঁসি, এলাহাবাদ, কানপুর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে বিক্ষোভের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। আতঙ্কিত ব্রিটিশশক্তি। গ্রামে গ্রামে নিপীড়িত কৃষক মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল—সন্ন্যাস বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহের রক্তাভ অগ্নিশিখায় দিগন্ত হয়েছিল উদ্ভাসিত। বাংলা সাহিত্যে ও লোকগীতিতে এর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। এই বিদ্রোহের স্বরূপ ও শক্তির পরিমাপ প্রসঙ্গে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর বক্তব্য সবিশেষ অনুধাবনযোগ্য :—"বাংলাদেশ তার কৃষককূল সম্পর্কে গর্ববোধ করতে পারে,..... শক্তি নেই, অর্থ নেই, রাজনৈতিক জ্ঞান নেই, এমনকি নেতৃত্বও নেই, তবুও বাংলার কৃষকেরা এমন একটি বিপ্লব সংগঠিত করতে পেরেছে, যাকে অন্যদেশের বিপ্লবের থেকে কি ব্যাপকতায় কি গুরুত্বে কোন দিক থেকেই নিকৃষ্ট বলা চলে না!" নীল বিদ্রোহ প্রসঙ্গে সর্ব প্রথমেই যে গ্রন্থের নাম মনে পড়ে সেটি হ'চ্ছে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ'। সেদিন কি করে এই বই লেখা হ'য়েছিল ভাবলে বিস্ময় জাগে। ব্রিটিশ সরকারের কলঙ্ক-অপনোদনের বৃথা চেষ্টায় শিকার হ'তে হ'ল অনুবাদক পাদরী লঙ সাহেবকে। কিন্তু সমস্ত কৃষক সমাজের হৃদয়ে যে আগুন জ্বলে উঠল তা কিন্তু নেভানো সম্ভব হল না এই পদ্ধতিতে। মীর মশারফ হোসেন গ্রামের জমিদার-প্রভুদের সম্বন্ধে তাঁর "জমিদার-দর্পণ"-এ লিখলেন—"আচ্ছা মফস্বলে একরকমের জানওয়ার আছে জানেন? তারা কেউ শহরেও বাস করে। শহরে কুকুর, কিন্তু মফস্বলে ঠাকুর। শহরে কেউ কেউ জানে এ জানওয়ার বড় শান্ত, বড় ধীর, বড় নম্র, হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মাছ মাংস ছোঁয় না। কিন্তু মফস্বলে শৃগাল, কুকুর, শুকর, গরু, পর্যন্ত পার পায় নাই না। বলব কি জানওয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে রাজা হয়ে বসে।"

কিন্তু বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়, যারা সাম্রাজ্যবাদের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল—নিজস্ব সংস্কৃতিকে হারিয়ে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করে নিজেকে সুসভ্য শ্বেত জাতির তাম্বুল পাত্রবাহী করে তুলেছিল, তারা এই বিদ্রোহের বিরোধিতা করল। তারা চাইল শান্তি ও নিরাপত্তা ; যাতে করে তারা সুশৃঙ্খলভাবে প্রজাদের শোষণ করতে পারে তার জন্য আশ্রয় নিলো বৃটিশ শক্তির বুটের তলায়। ফলে তাদের গড়া সংস্কৃতি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হলো না। পুরোনো কুসংস্কারে জরাজীর্ণ সভ্যতাকে 'দেশাচার', 'লোকাচার', 'জাতীয় ঐতিহ্য', সুমহান সভ্যতার বশংবদ বলে চালাতে শুরু করল। এই প্রচার কার্যে যিনি অগ্রণী ছিলেন তিনি হলেন 'ঋষি' বঙ্কিম। ভাষার ওপর দখল ছিল তাঁর অপরিসীম, বক্তব্যকে রঙে রসে রহস্যে রোমাঞ্চে ভরিয়ে উপস্থিত করার দক্ষতা ছিল তুলনাবিহীন। দ্বন্দ্বসংকুল জীবনের জটিল সমস্যার রূপায়ণে তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। 'চন্দ্রশেখর', 'বিষবৃক্ষ', কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রজনী' প্রভৃতি উপন্যাসে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন দিগন্তের সূচনা দেখা দিল। কিন্তু সে সূচনা শুভ ছিল না। নারীর সামন্তশোষণ থেকে মুক্তি, স্বাধীনভাবে প্রেমনিবেদনের অধিকার, জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ উপভোগ করার বাসনা ধিক্কৃত হয়েছিল তাঁর উপন্যাসে। শৈবলিনীর প্রেমের স্বাধিকারকে তিনি কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন, বালবিধবা কুন্দর প্রণয়াভিমানকে তিনি তিলে তিলে হত্যা করেছিলেন। যৌবনমদমত্তা রোহিণীর জীবনের আনন্দ উপভোগের বাসনাকে তিনি পিস্তলের গুলি উপহার দিয়েছিলেন। ভারতীয় সামন্ত সমাজের তিনি প্রভু। হিন্দু সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির গর্ভোত্থিত নব-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের তিনি চিন্তানায়ক, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণযন্ত্রের তিনি ডেপুটি। এই হলো তাঁর পরিচয়। অতএব স্বাধীনভাবে বক্তব্য রাখা, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কথা বলা তাঁর পক্ষে ছিল 'বেয়াদপি'। 'আনন্দমঠের' ধ্বজা তুলে তিনি যতই 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিন, আসলে সাম্রাজ্য-বাদ-নির্ভরতাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ঐ উ ন্যাসের প্রায় শেষাংশে তার পরিচয় আছে। সন্ন্যাস বিদ্রোহের মত অত বড় একটা অগ্নিগর্ভ ঘটনাকে তিনি রহস্যে, রোমাঞ্চে, মধ্যযুগীয় শিহরণে এবং সর্বোপরি সাম্প্রদায়িকতার পুণ্যবারি সিঞ্চনে বিকৃত করেছেন। 'সাম্য' গ্রন্থে তিনি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের সংস্কৃতির চোলাই

মালের সংগে ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল দর্শনের বহু বক্তব্যকে জুড়ে দিয়ে বৃটিশ শক্তি এবং ভারতীয় সামন্তশক্তির সঙ্গে সাম্য আনতে চেয়েছিলেন। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' অহিফেনের ঘোরে নসিরামবাবুর বৈঠকখানা থেকে একেবারে বৃটিশের তৈরী আদালতের দোরগোড়া পর্যন্ত পাঠককে তিনি ঘুরিয়েছেন ঠিক কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত, আর বিড়বিড় করে আবৃত্তি করেছেন সাম্রাজ্যবাদী-সামন্তবাদীয় দর্শন। এখানে তিনি 'চিন্তানায়ক'। এই ঋষিকে আশ্রয় করে বহু 'বালখিল্য তাপসকুমারের' দল বাংলাসাহিত্যের প্রাঙ্গণকে মুখরিত করে তুলে-ছিল। তাঁদের কলহাস্য ছিল রাত্রির দুঃস্বপ্নের মত রোমাঞ্চকর রহস্যে ভরপুর।

কিন্তু এই রোমাঞ্চের নীলাভ আবরণ ভেদ করে এসে দাঁড়ালেন যিনি পাঠকের সামনে তিনি রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গসংস্কৃতির ইতিহাসে সে সময়টা ছিল একা ধারে সুদিন আর দুর্দিন। অনেক ঘটনায়, অনেক বিক্ষোভে বাংলাদেশের সমাজ সেদিন আলোড়িত হচ্ছিল। একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রচণ্ড নিপীড়ন, ভারতীয় জমিদার প্রভুদের নির্মম অত্যাচার—আর অপর দিকে 'নীল বিদ্রোহ' 'ফরাজ পুরের বিদ্রোহ', 'গারো বিদ্রোহ', মুণ্ডা-খাসিয়া বিদ্রোহ', তাঁতি বিদ্রোহ', 'সুন্দর বনের বিদ্রোহ', 'পাবনা ও বগুড়ার কৃষক বিদ্রোহ', 'কুকিবিদ্রোহ' 'ত্রিপ্রা বিদ্রোহ'—ইত্যাদি অগ্নিগর্ভ অসন্তোষের রক্তবর্ণ রোষবহ্নি। এই পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে আলোড়িত হ'চ্ছিল সারা ভারতের সমাজব্যবস্থা, স্বভাবতঃই বাংলাদেশে ও তার দোলা এসে লেগেছিল। রাষ্ট্রশক্তি ক্রমশঃই হচ্ছিল প্রবল। তার চাপে শহুরে বঙ্গসংস্কৃতির ধারক-বাহকেরা পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ হ'তে শুরু করেছিল। 'রুশো', 'ভল্টেয়ার', 'শেলী' 'বায়রণ' পড়া বাঙালীরা ইংরেজ শাসনকে মেনে নিতে অস্বীকার করল। অবশ্য তারা গ্রামীণ জনতার মত সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটানোকে মেনে নিতে চাইছিল না। 'আবেদন-নিবেদন', 'বাদ-প্রতিবাদ', 'সভা-সমিতি', 'কাগজ পত্র'মারফৎ বুদ্ধিজীবি বাঙালী সম্প্রদায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইল। 'শিক্ষা', 'রুচি', 'সংস্কৃতি, প্রভৃতির দিক থেকে তারা নিজেদের অনেক উন্নত শ্রেণীর জীব বলে মনে করত, তাই তারা গ্রামীন জনতার সাথে কাঁধ মিলিয়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণআন্দোলনের জন্ম দিতে পারল না। ফলে আন্দোলন হল দুর্বল। বিচ্ছিন্নতাবাদী, উন্নাসিক এবং আবেগনির্ভর। এই আবহাওয়ার মধ্যে 'হিন্দুমেলা'র প্রতিষ্ঠা হল। রবীন্দ্রনাথ এই মেলাতে তাঁর স্বদেশাত্মবোধক কবিতা প্রবন্ধাদি পাঠ করতেন। তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে পরিবার ছিল উচ্চরুচি সম্পন্ন ধনী পরিবার। কয়লাখনি মালিক ছিলেন তাঁর পিতামহ আর তাছাড়া শিলাইদহে তাঁদের বিরাট জমিদারী ছিল। অতএব অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা ছিলেন সামন্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর। অবশ্য তা ছিল সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর। কিন্তু সংস্কৃতিরদিক থেকে তাঁদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-

বিরোধিতা গড়ে উঠেছিল। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় বৈদান্তিক ধর্মের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। দাদারা উচ্চশিক্ষিত এবং স্বাধীনমনা। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত গুণ পেয়েছিলেন। সাহিত্যের মতাদর্শের বিচারে তিনি ছিলেন ভগ্নায়মান ওরিয়েণ্টাল (প্রাচ্য) সভ্যতার নবজন্মদাতা। আজীবন তিনি যে সংস্কৃতি প্রচার করেছিলেন তা ছিল পাশ্চাত্ত্য জড়বাদ-বিরোধী ভাববাদী দর্শন। ঔপনিষদিক ব্রহ্মতত্ত্বকে তিনি নবজন্ম দিয়েছিলেন নতুন যুগের আলোকে। তাঁর দৃষ্টি ছিল গভীর, ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ। প্রকাশভঙ্গী ছিল রোমাণ্টিক। ভারতীয় সভ্যতার অতীতের গোপন অন্ধকারে আধো-আলো আধো-আঁধারি পথে নিঃশব্দ বিচরণ করে তিনি উপহার দিয়েছিলেন 'সন্ধ্যাসঙ্গীত', 'প্রভাত সঙ্গীত', 'মানসী,' 'চিত্রা', 'কণিকা', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি', 'বলাকা', 'পূরবী', 'শ্যামলী', বনবীণা'।

ইংরেজ সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বাঙালীর মনে যে নবজাগরণের অস্পষ্ট আলোক এসেছিল তা নানা সংশয়, বিচ্যুতি, নানা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে সুষমামণ্ডিত হয়েছিল, সম্পূর্ণ সুস্থ অবয়ব পেয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে শেষ বিচারে বলা যায় তিনি ভাববাদী চিন্তার সর্বোত্তম পুরুষ। ভঙ্গী কতকাংশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, আবেদন বুর্জোয়া রোমাণ্টিকতায় ভরা। তবে তা বিক্ষোভে চঞ্চল নয়, উপনিষদের মন্ত্রে ধ্যানস্তব্ধ। সামন্তবাদী চিন্তা অস্পষ্টভাবে ক্রিয়াশীল, দৃষ্টি মূলতঃ বস্তুবাদ-বিরোধী। বঙ্কিমের পরবর্তী সময়ে একদিকে ব্রিটিশসাম্রাজ্যবাদের হুঙ্কারজনক শোষণ, দেশীয় সামন্তগোষ্ঠীর অবক্ষয়ের ক্রন্দন এবং কম্প্রাডর বুর্জোয়া শ্রেণীর হতচকিত অবস্থা তখন তাঁর আবির্ভাব। তিনি প্রত্যেককে মুক্তি দেখাতে গিয়ে অতীত ভারতের ঔপনিষদিক ব্রহ্মলোকে নির্বাসন দিলেন।

তাঁর উপন্যাস 'গোরা', 'চোখের বালি', 'চার অধ্যায়', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে' ইত্যাদিতে তাঁর নিজের দর্শন সুপরিস্ফুট। সন্ত্রাসবাদ ধিক্কৃত হয়েছে (ঘরে বাইরে, চার অধ্যায়), মানসিক প্রস্তুতিবিহীন আবেগসর্বস্বতা যে প্রকৃত রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম দিতে পারে না, তা যে অসুস্থতায় পর্যবসিত হয় ('ঘরে বাইরে'-র 'নিখিলেশ', 'বিমলা' এবং 'চার অধ্যায়'-এর এলা অতীনের চরিত্রে) এবং অন্যদিকে গোঁড়া পথে চলে (গোরা উপন্যাসের 'গোরা') লক্ষ্যকে নষ্ট করে তা দেখিয়েছেন। মানুষের অন্ধ আদিম গুহায়িত কামনা যে কি নিদারুণ সত্য হয়ে উঠে মানবসভ্যতার সমস্ত সাধনাকে ব্যর্থ করে, তা চতুরঙ্গের 'দামিনী',

'শচীশ', চোখের বালির 'বিনোদিনী' 'মহেন্দ্র' চরিত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এই সমস্ত উপন্যাসের বক্তব্য একদিকে যেমন সামন্ততন্ত্র-আশ্রয়ী উদার বৈদান্তিক সভ্যতার ধারক, তেমনি অন্যদিকে তা নবজাগরণ উদ্ভূত বাঙালী সমাজের জীবন যাত্রার আকাঙ্ক্ষা, বিচ্যুতি এবং ফাঁককে দেখিয়েছে নির্মমভাবে নারীর মর্যাদা, তার স্বাধিকার সেখানে অংশতঃ স্বীকৃত হয়েও শেষ পর্যন্ত কর্তব্যবোধের বেড়ায় অবরুদ্ধ হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা অনেকাংশ ধিক্কৃত। তবুও 'রথের রশি', অচলায়তন' নাটকে এবং 'সভ্যতার সঙ্কট', 'কালান্তরে' রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব সমাজের ঐতিহাসিক সত্যের এক অর্ধাংশ দেখিয়েছেন। সেই অর্থে তিনি প্রগতিশীল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি কখনই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেননি, কারণ তিনি ভাবের দৃষ্টিতে, উপনিষদের ব্রহ্মবাদের Platform-এ দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের নগ্ন শোষণকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন, কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে কখনও অনিচ্ছাসত্ত্বে। রোমাঁ রঁল্যা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়ে কালান্তরের পথিক হতে পেরেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ আয়ু নিয়ে প্রায় দুটো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে থেকেও—পুঁজিবাদের পতন, সাম্রাজ্যবাদের অপমৃত্যু এবং জনগণের অদম্য শক্তিতে বিশ্বাস রেখে যেতে পারলেন না—কালান্তরের রথে চেপেও তিনি কালের যাত্রী হয়েই রইলেন। বাংলাসাহিত্যের চরম ট্রাজেডী এটাই। এই ট্রাজেডীর মূল্য দিতে হয়েছিল রবীন্দ্রকালীন এবং রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যকে।

এই ভাববাদী ট্রাজেডীর যিনি প্রথম বলি তিনি হ'লেন শরৎচন্দ্র। পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা তাঁর ছিল অপূর্ব, ক্ষীয়মান বাঙালী সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপর দাঁড়িয়ে তিনি লিখেছেন "পল্লীসমাজ", "গৃহদাহ" "অরক্ষণীয়া", "শ্রীকান্ত", "চরিত্রহীন।"

বাঙালী সমাজের সামন্ত পরিবারের যে ধ্বংস অনিবার্য, তার ভিত্তিতে যে ঘুণ ধরেছে এই নির্মম সত্যকে তিনি বেদনার বাণীর মাল্যে পাঠককে উপহার দিয়েছেন। দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর ছিল পেটি-বুর্জোয়া সুলভ। জনগণের অদম্য শক্তিতে তিনি হতাশাবাদী হয়ে পড়েছিলেন। হৃদয়ের কারবার দিয়ে তিনি সংকটকে এড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধকালীন এবং তার পরবর্তী সময়ের যে প্রচণ্ড সংকট যা সমগ্র বাংলার সমাজের ভিত্তি ধরে নাড়া দিয়েছিল, পুরোনো শিথিল মূল্যবোধকে ভেঙ্গে চুরে দিচ্ছিল শরৎচন্দ্র তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। একদিকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণআন্দোলনে উগ্রপন্থী রোমান্স, মধ্যপন্থী সমন্বয়বাদ এবং

নরমপন্থী আপোষ মীমাংসার রাজনীতির জন্ম দেখা দিয়েছিল—প্রত্যক্ষ সশস্ত্র গণ আন্দোলন কখনও মধ্যপথে কখনও ভুল পথে পরিচালিত হয়ে শোষিত জনগণের ঐক্যকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করেছিল ; অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণে, নিষ্পেষণে বাংলার ঘরে ঘরে উঠেছিল হাহাকার ক্রন্দন। সংরক্ষণশীল বাঙালী সমাজ তখনও গণ্ডী দিয়ে নিজের বিষাক্ত জঠরে নারীকে আটকে রাখার চরম ফন্দী করছিল, অন্যদিকে নারী পেটের দায়ে হয়ে উঠেছিল ভোগের পণ্য, বিলাসীর নর্মসহচরী। সমগ্র সমাজের এই চরম বেদনাকে শরৎচন্দ্র ফুটিয়ে তুললেন তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রে। নবজাগরণের মিথ্যা আবরণ খসে পড়ল—গৃহদাহ হল—অচলা হল অচল, চরিত্রহীন মানুষের কবলে লাঞ্ছিত হল কিরণময়ী, পল্লী সমাজের রমা কাশীতে হল নির্বাসিতা। শ্রীকান্ত তার ভবঘুরে জীবনের পথে পথে ঘুরে বেড়াল। দূরে আড়ালে পড়ে রইল রাজলক্ষ্মীর অশ্রু, কমললতার নিঃশব্দ বেদনা। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তারপর এল সব্যসাচী পেটি বুর্জোয়া আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে—রেঙ্গুন-বর্মার নগরে শহরে ভারতী, অপূর্ব, সুমিতা বাঙালী সমাজের নতুন অধ্যায়ের জন্ম দিতে চাইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সফল হল না। এক ঝড়ের রাতে জীবনের জয়যাত্রার ভূমিকা অসমাপ্ত রেখে বিদায় নিল সব্যসাচী। আদর্শবাদ বিচ্যুত হয়ে অবরুদ্ধ ঘরে পড়ে রইল ভারতী, অপূর্ব, শশী বাঙালী সমাজের চরম দুর্দিনের দুর্বোধ্য জটিল সংকটময় অন্ধকারের দিকে চেয়ে। শরৎচন্দ্রের কলম থামল। কিন্তু সংকট থেমে রইল না। সে আরও ঘনীভূত হল। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ দরজায় আঘাত দিতে লাগল। সবাই ভাবছিল, তারপর ?

তারপর কল্লোল—হ্যাঁ কল্লোল যুগ। সাম্রাজ্যবাদ যে চরম দুর্বল হয়ে পড়েছে তা প্রমাণিত এই যুগের সাহিত্যে। রেশনের লাইন, মিলিটারী ব্যারাক, আর ভোগ লালসা, দুর্ভিক্ষ। রবীন্দ্রনাথ যে বলতেন মানুষ আনন্দের সন্তান অমৃতলোকযাত্রী তা ব্যর্থ হল অভাব অনটনের রোলারে। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার দুর্গন্ধ চোলাই মাল সীমান্ত পেরিয়ে প্রবেশ করল বাংলায়। এল ন্যুট হামসন, 'hunger' 'great hunger'-এর ছেঁড়া পাতা। আর অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারার দোলা লাগল বাঙালীর মানস জগতে—তবে তা ছিল অস্পষ্ট। শ্রমিক সমাজের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আবেগ-সর্বস্ব অভিযান, সর্বহারার সংগ্রামের অস্পষ্ট ব্যাখ্যা শোনা যেতে লাগল। এমন সময় দেখা দিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ। প্রেমেন্দ্রবাবু কুলি মজুরের জন্য কবিতা লেখার শপথ নিলেন, আর শৈলজানন্দের

কলমে বেজে উঠল 'কয়লা কুঠির' গান। আধুনিক হবার মোহ ছিল অনেকখানি এঁদের। গায়ে ধূলোবালি মেখে পাখার তলায় বসে এঁরা শ্রমিকদের সহযোগী ভাবতেন, তাদের দুঃখময় জীবনের রৌদ্রদগ্ধ অভিজ্ঞতার বাণীকার হিসেবে চিহ্নিত করতেন। এঁদের লেখার বলিষ্ঠতা এলেও, বিষয়ের নতুনত্ব এলেও পেটি বুর্জোয়া সুলভ লাম্পট্যবাদের মোড়কে তা বহুলাংশে আবৃত ছিল আর সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা তাতে মাঝে মাঝে শোনা গেলেও গণঅভ্যুত্থানের বিজ্ঞান সম্মত উপস্থাপনা অনুপস্থিত ছিল। এঁরা সাধারণ মানুষের কবিতা নতুনত্বের চমক দেবার জন্য লিখেছিলেন, কোন তত্ত্বগত প্রেরণা ছিল না। 'দারিদ্র্যের বিলাসিতা' 'কুলিমজুর ভাইদের' কবিতা লেখার সখ তাই বেশী দিন রইল না। কেটে গেল ১৯৪৭-এর পর থেকেই। শোষক শ্রেণীর রুচি বদলের সঙ্গে প্রেমেন্দ্রবাবু এবং শৈলজানন্দেরও ভোল পাল্টাল। এখন তাঁরা আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-ঔপনিবেশিক ভারতকে স্বাধীন ভারত বলে চালিয়ে শোষক শ্রেণীর স্বার্থে বস্তা বস্তা সাহিত্য নির্মাণ করছেন। আর প্রতিক্রিয়াশীলরা তাঁদের দীর্ঘজীবন কামনা করছে।

কল্লোলের আর এক বেঞ্চিতে বসেছিলেন হীরেন মুখার্জী, গোপাল হালদার, সুভাষ মুখার্জী।

নিজেদের এঁরা 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে তাঁরা হচ্ছেন 'কম্যুনিষ্ট কবি' বা 'লাল কবি'। হুঙ্কার ছিল তাঁদের ভাষণে—কিন্তু গভীরতা ছিল না। প্রত্যক্ষ গণআন্দোলন তখন হয়নি, হয়নি সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে বিক্ষোভ বিদ্রোহ। হয়েছিল কিছু পোষ্টার, কিছু সংশোধনবাদী লাইন, চায়ের টেবিলে কিছু টাইফুন উঠেছিল এবং প্রচুর সিগারেটের ছাই জমেছিল। এরই ফলশ্রুতি দেখি তাঁদের 'বিপ্লবী' দৃঢ়তার শ্রেণী-সহাবস্থানের হুঙ্কারজনক দর্শনে রূপান্তরের মধ্যে। 'বিপ্লবী' হীরেনবাবু প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদের স্বদেশী মুখপাত্র গান্ধী আর নেহরুর পাদপদ্মে অর্ঘ্য দিলেন, গোপালবাবু 'সর্বহারা' নাম প্রায় ভুলে গিয়েই সংশোধন-বাদী প্রতিক্রিয়াশীল মননশীল সাহিত্য লিখে চললেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য'—বলে প্রথম দিকে খুব চমক দিলেও শেষরক্ষা করতে পারলেন না। লালরঙ ক্রমশ ফিকে হ'তে শুরু করল। আপাততঃ তিনি গোলাপ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, অবশ্য এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। প্রেমেন্দ্র

মিত্র মহাশয় মার্কসবাদের চর্চা বহুদিন ছেড়ে দিয়ে "আরও প্রগতিশীল" লেবেল মারা 'রকেটি সাহিত্য' নিয়ে ব্যস্ত, কোথাকার কোন্ মুখ্যু চাষী কিসের লড়াই করছে তা নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা হবার কথা নয়।

এই প্রসঙ্গে 'মহান' সাহিত্যরথী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৬ সালে যে 'প্রগতি লেখক ও শিল্পীসংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি তাতে যোগদান করেন। প্রকাশিত হয় 'পঞ্চগ্রাম', 'গণদেবতা'। বাংলাসাহিত্যে সাময়িক আলোড়ন উঠল বটে, কিন্তু যে সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী তারাশংকরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার প্রভাব অতিক্রম করা অসম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে। তাই অনিবার্যভাবেই অল্পকাল মধ্যে তিনি পরিণত হ'লেন 'স্বাধীন শিল্পী'-তে। আর কি চাই, এবার শুরু হ'ল চুটিয়ে কমিউনিজমের শ্রাদ্ধ এবং তৎসূত্রে গান্ধীবাদী গোলাপগন্ধী গল্প রচনা। কমিউনিজম সম্পর্কে তিনি বলেন—"...গরীব, গৃহস্থ, ধনী, অলেখক, যে কোন লেখকের, বড় লেখকের সঙ্গে মেলামেশায় তো আমি কোন কম্যুনিস্ট লেখকের থেকে আলাদা নই। সুতরাং ও সংজ্ঞাগুলো আমাকে স্পর্শ করে না বা আমার সম্পর্কে খাটে না।...চার-পাঁচ বছর বয়েস থেকেই ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাস করি। নাস্তিক্যবাদ চর্চা করতে গিয়ে শান্তি পাইনি।"

এর পাশেই যখন দেখি 'বিদ্রোহী' কবি নজরুলের দৃপ্ত ঘোষণা সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে :—

"লাথি মার, ভাঙরে তালা, যত সব বন্দীশালায় আগুন জ্বালা
আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি।" (ভাঙার গান)

তখন স্পষ্টতঃই সাচ্চা সাহিত্যের স্বরূপটি বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তিনি কাব্যের মাধ্যমে অগণিত ভারতবাসীর মজ্জায় মজ্জায় সঞ্চারিত করলেন, তা শতসহস্র বলিষ্ঠ তরুণের মুক্তিসংগ্রামে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা যুগিয়েছিল। "কোমল কান্ত ললিত মধুর বাঙলা কবিতার ভাষা যে এত সংগ্রামশীল ও শক্তিশালী হ'তে পারে, তা নজরুলের কবিতা না পড়লে বোঝা যায় না" (ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত, "নজরুল-চরিত মানস")। মুক্তকণ্ঠে কবি গেয়েছেন—"মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু

মহীয়ান"। সমগ্র বাংলাসাহিত্যকে প্রগতিচিন্তার জোয়ারে প্লাবিত করে দিয়েছেন তিনি।

এই কল্লোল যুগেরই আশ্চর্য, অবাক করে দেওয়া আর এক নক্ষত্রের নাম মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ফ্রয়েডীয় যৌনসর্বস্বতার শিকার হয়েছিলেন তিনিও, কিন্তু সহজেই তার অসারতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং অতিক্রমের ফসল হিসাবে পাঠককে উপহার দিয়েছেন জীবনের জয়গানে ভরপুর সংগ্রামে মুখর মানুষের কাহিনী। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন চরম আত্মপ্রত্যয়ী, দারিদ্র্যের সুতীব্র দংশন সত্ত্বেও আদর্শে অবিচল, শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে আপোষহীন। সাহিত্য রচনার সূত্রপাত ঘটার সময় থেকেই তাঁর মনে সাহিত্যে বাস্তবতার প্রশ্ন জেগেছিল। এই সময় ভাববাদ ও বস্তুবাদের যন্ত্রণাময় দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়েছে তাঁর মানসরাজ্যে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"কলেজ থেকে তখনকার বালিকা বালীগঞ্জের বাড়িতে ফিরতাম, আলোহীন পথহীন অসংস্কৃত জলার মতো লেকের ধারে গিয়ে বসতাম—চেনা অচেনা কোন একটি প্রিয়ার মুখ স্মরণ করে একটু চলতি কাব্যরস উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে। ভেসে আসত নিজের বাড়ীর আত্মীয়-স্বজন আর পাড়াপড়শীর মুখ, জীবনের অকারণ জটিলতায় মুখের চামড়া যাদের কুঁচকে গিয়েছে। ভেসে আসত ষ্টেশনে ও ট্রেনে ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের মুখ—তাদের আলাপ-আলোচনা, ভেসে আসত কলেজে সহপাঠীদের মুখ—শিক্ষার খাঁচায় পোরা তারুণ্য-সিংহের সব শিশু, প্রাণ শক্তির অপচয়ের আনন্দে যারা মশগুল। তারপর ভেসে আসত খালের ধারে, নদীর ধারে, বনের ধারে বসানো গ্রাম—চাষী, মাঝি, জেলে তাঁতিদের পীড়িত ক্লিষ্ট মুখ। লেকের জনহীন স্তব্ধতা ধ্বনিত হ'ত ঝিঁঝির ডাকে, শেয়াল ডেকে পৃথিবীকে স্তব্ধতর করে দিত, তারারা চোখ ঠারতো আকাশের হাজার ট্যারা চোখের মত, কোনদিন উঠত চাঁদ। আর ওই মুখগুলি—মধ্যবিত্ত আর চাষা ভূষা—ওই মুখগুলি আমার মধ্যে মুখর অনুভূতি হয়ে চ্যাঁচাতো—ভাষা দাও—ভাষা দাও।" (**গল্প লেখার গল্প**)

মাণিকবাবু ভাষা দিয়েছিলেন। তাঁর "পুতুল নাচের ইতিকথা", "পদ্মানদীর মাঝি" সেই সাক্ষ্য বহন করছে। 'প্রাগৈতিহাসিকে'র ভিখু, 'পদ্মানদীর মাঝি'-র হোসেন, 'ছোট বকুল পুরের যাত্রী'-র গগন—এরা প্রত্যেকেই জীবনের এক একটি অজ্ঞাত, অপরিচিত দরজা খুলে দেয়। গগন যখন বলে—

"এ লড়ায়ে মোরা মরব। মোদের ছেলে-পুলেরা সত্যযুগ করবে।" তখন স্বভাবতঃই এই দুঃসাহসিক বৈপ্লবিকতার ছোঁয়ায় পাঠকমন বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়। "শহরতলী" উপন্যাসের যশোদা যখন বলে—"ভদ্রলোক কাকে বলে জানো না? চাষা মজুরকে যারা ঘেন্না করে, বড় লোকের পা চাটে, ন্যাকা ন্যাকা কথা কয়, আধপেটা খেয়ে দামী দামী জামা কাপড় পরে, আরাম চেয়ে চেয়ে ব্যারামে ভোগে, খালি নিজের সুখ খোঁজে, মান অপমান বোধটা থাকে টনটনে, কিন্তু যত বড় অপমান হ'ক দিব্যি সয়ে যায়, কিছু না জেনে সবজান্তা হয়।" তখন এর চাইতে ভাল ব্যাখ্যা 'ভদ্রলোক'-দের সম্বন্ধে আমরা দিতে পারি না। চিরাগত সংস্কারকে চূর্ণ করে, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকারের লক্ষণ নির্দেশ করে, যৌনতার মুখোসে সত্যকে আবৃত না করে মেহনতী মানুষের জীবনসংগ্রামের বলিষ্ঠ ও সার্থক প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করার গৌরব মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এরপর কিশোর কবি সুকান্তের আবির্ভাব। তাঁর বিদ্রোহ ঘোষিত হল সমস্ত শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে, সমস্ত অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, সমস্ত মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে। বিপ্লবী কবি সুকান্ত দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন :—

"দেখবো, ওপরে আজো আছে কারা,
খসাবো আঘাতে আকাশের তারা
সারা দুনিয়াকে দেবো শেষ নাড়া
ছড়াবো ধান।
জানি রক্তের পেছনে ডাকবে সুখের বান।'

শ্রেণীশত্রুর প্রতি তিনি ক্ষমাহীন :—

"প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা
ভেঙেছিস ঘর বাড়ী
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে কখনো ভুলতে পারি।
আদিম হিংস্র মানবিকতার আমি যদি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবোই।"

সুকান্তর অকালমৃত্যুতে বাংলাসাহিত্য অপূরণীয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাঁর সংগ্রামীর চেতনার আগুনে অনুপ্রেরিত হয়ে হাজার সুকান্ত জন্মগ্রহণ করবে— এ বিশ্বাস আমাদের আছে। বহু তরুণ লেখক এগিয়ে এসেছেন

প্রগতিশীল পরীক্ষানিরীক্ষার চিন্তাধারা নিয়ে সংগ্রামকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য। তাঁরা জনসাধারণের জীবনের শরিক হয়ে, তাঁদের উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ করে, তাঁদের সমপর্যায়ত্ব অর্জন করার জন্য গ্রামে গঞ্জে, কলকারখানায় ও খনি ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করছেন। এঁদের রচনায় রূপলাভ করছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে জনসাধারণের গৌরবময় সংগ্রামী ভূমিকা।

অপরদিকে এই বিপ্লবী সাহিত্যের কণ্ঠরোধের জন্য সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা থেকে আমদানী হ'চ্ছে যৌন অশ্লীলতায় ভরপুর গাদা গাদা উপন্যাস, প্রবন্ধ, সচিত্র মাসিক পত্র ইত্যাদি। এরই নাম দেওয়া হ'চ্ছে 'বাস্তবতা', এই নাকি আমাদের সমাজের সংস্কৃতি! এই অবক্ষয়ী সংস্কৃতির ভগ্নদূত কিছু বুদ্ধিজীবী তাঁদের অশালীন, অশ্লীল সাহিত্য চর্চার নাম দিয়েছেন "স্বাধীন শিল্পকলা"! এঁদের বিকৃত জীবনাদর্শের অপর নাম নাকি "শিল্পীর স্বাধীনতা"! এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান মাও সেতুঙের ইয়েনান বক্তৃতার প্রসঙ্গ মনে পড়ে, যেখানে তিনি বলেছেন, "যে বুদ্ধিজীবিরা মনের দিক থেকে বদলালো না তারা নোংরা; চূড়ান্ত বিচারে শ্রমিক-কৃষকেরা সব চেয়ে পরিষ্কার মনের লোক এবং যদিও তাদের হাত ময়লায় ভরা আর পা গোবর ল্যাপটানো তারা আসলে বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিদের চেয়ে অনেক বেশী পরিষ্কার।" একথা যে কতবড় সত্যি তা ঐ তথাকথিত অভিজাত বিদগ্ধ লেখকদের (বুদ্ধদেব বসু, সমরেশ বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদির) লেখা পড়লেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিপ্লবী চেতনাকে সর্বপ্রকারে দমিয়ে দেবার এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী লেখক সমাজ গর্জে উঠেছেন। জনতার কাছে আজ কে শত্রু কে মিত্র, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আজ নকশালবাড়ীর রক্তাভ অগ্নিচেতনায় উজ্জীবিত হয়ে শ্রীকাকুলাম, লখিমপুর, চম্পারণ, মুসাহারী, গোপীবল্লভপুরে কৃষিবিপ্লবের জয়যাত্রার সূচনা হয়েছে। আজ লেখক সমাজের কাছে আমাদের আশা অনেক। এই মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবেই লেখনীকে ব্যবহার করবেন তাঁরা। মার্কসবাদী শিল্পীর অন্যতম কর্তব্য এই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আঘাতের পর আঘাত করে একে গুঁড়িয়ে দেওয়া। তাই যে বুর্জোয়া সংস্কৃতি এই সমাজব্যবস্থা টিঁকিয়ে রাখার পক্ষে, তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন আমাদের প্রগতিশীল শিল্পীবৃন্দ। নূতন দিগন্তের আভাস পাওয়া যাচ্ছে ইতিমধ্যেই। এই সংগ্রামী চেতনার কণ্ঠরোধের জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং শোধনবাদীরা যত অপচেষ্টাই চালিয়ে যাক না কেন, জয় আমাদের হবেই! নতুন দিনের জন্ম আমরা দেবোই!

মিত্র মহাশয় মার্কসবাদের চর্চা বহুদিন ছেড়ে দিয়ে "আরও প্রগতিশীল" লেবেল মারা 'রকেটি সাহিত্য' নিয়ে ব্যস্ত, কোথাকার কোন্ মুখ্যু চাষী কিসের লড়াই করছে তা নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা হবার কথা নয়।

এই প্রসঙ্গে 'মহান' সাহিত্যরথী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৬ সালে যে 'প্রগতি লেখক ও শিল্পীসংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি তাতে যোগদান করেন। প্রকাশিত হয় 'পঞ্চগ্রাম', 'গণদেবতা'। বাংলাসাহিত্যে সাময়িক আলোড়ন উঠল বটে, কিন্তু যে সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী তারাশংকরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার প্রভাব অতিক্রম করা অসম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে। তাই অনিবার্যভাবেই অল্পকাল মধ্যে তিনি পরিণত হ'লেন 'স্বাধীন শিল্পী'-তে। আর কি চাই, এবার শুরু হ'ল চুটিয়ে কমিউনিজমের শ্রাদ্ধ এবং তৎসূত্রে গান্ধীবাদী গোলাপগন্ধী গল্প রচনা। কমিউনিজম সম্পর্কে তিনি বলেন—"...গরীব, গৃহস্থ, ধনী, অলেখক, যে কোন লেখকের, বড় লেখকের সঙ্গে মেলামেশায় তো আমি কোন কম্যুনিস্ট লেখকের থেকে আলাদা নই। সুতরাং ও সংজ্ঞাগুলো আমাকে স্পর্শ করে না বা আমার সম্পর্কে খাটে না।...চার-পাঁচ বছর বয়েস থেকেই ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাস করি। নাস্তিক্যবাদ চর্চা করতে গিয়ে শান্তি পাইনি।"

এর পাশেই যখন দেখি 'বিদ্রোহী' কবি নজরুলের দৃপ্ত ঘোষণা সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে ঃ—

"লাথি মার, ভাঙরে তালা, যত সব বন্দীশালায় আগুন জ্বালা
আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি।" (ভাঙার গান)

তখন স্পষ্টতঃই সাচ্চা সাহিত্যের স্বরূপটি বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তিনি কাব্যের মাধ্যমে অগণিত ভারতবাসীর মজ্জায় মজ্জায় সঞ্চারিত করলেন, তা শতসহস্র বলিষ্ঠ তরুণের মুক্তিসংগ্রামে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা যুগিয়েছিল। "কোমল কান্ত ললিত মধুর বাঙলা কবিতার ভাষা যে এত সংগ্রামশীল ও শক্তিশালী হ'তে পারে, তা নজরুলের কবিতা না পড়লে বোঝা যায় না" (ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত, "নজরুল-চরিত মানস")। মুক্তকণ্ঠে কবি গেয়েছেন—"মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু

মহীয়ান"। সমগ্র বাংলাসাহিত্যকে প্রগতিচিন্তার জোয়ারে প্লাবিত করে দিয়েছেন তিনি।

এই কল্লোল যুগেরই আশ্চর্য, অবাক করে দেওয়া আর এক নক্ষত্রের নাম মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ফ্রয়েডীয় যৌনসর্বস্বতার শিকার হয়েছিলেন তিনিও, কিন্তু সহজেই তার অসারতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং অতিক্রমের ফসল হিসাবে পাঠককে উপহার দিয়েছেন জীবনের জয়গানে ভরপুর সংগ্রামে মুখর মানুষের কাহিনী। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন চরম আত্মপ্রত্যয়ী, দারিদ্র্যের সুতীব্র দংশন সত্ত্বেও আদর্শে অবিচল, শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে আপোষহীন। সাহিত্য রচনার সূত্রপাত ঘটার সময় থেকেই তাঁর মনে সাহিত্যে বাস্তবতার প্রশ্ন জেগেছিল। এই সময় ভাববাদ ও বস্তুবাদের যন্ত্রণাময় দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়েছে তাঁর মানসরাজ্যে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"কলেজ থেকে তখনকার বালিকা বালীগঞ্জের বাড়িতে ফিরতাম, আলোহীন পথহীন অসংস্কৃত জলার মতো লেকের ধারে গিয়ে বসতাম—চেনা অচেনা কোন একটি প্রিয়ার মুখ স্মরণ করে একটু চলতি কাব্যরস উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে। ভেসে আসত নিজের বাড়ীর আত্মীয়-স্বজন আর পাড়াপড়শীর মুখ, জীবনের অকারণ জটিলতায় মুখের চামড়া যাদের কুঁচকে গিয়েছে। ভেসে আসত ষ্টেশনে ও ট্রেনে ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের মুখ—তাদের আলাপ-আলোচনা, ভেসে আসত কলেজে সহপাঠীদের মুখ—শিক্ষার খাঁচায় পোরা তারুণ্য-সিংহের সব শিশু, প্রাণ শক্তির অপচয়ের আনন্দে যারা মশগুল। তারপর ভেসে আসত খালের ধারে, নদীর ধারে, বনের ধারে বসানো গ্রাম—চাষী, মাঝি, জেলে তাঁতিদের পীড়িত ক্লিষ্ট মুখ। লেকের জনহীন স্তব্ধতা ধ্বনিত হ'ত ঝিঁঝির ডাকে, শেয়াল ডেকে পৃথিবীকে স্তব্ধতর করে দিত, তারারা চোখ ঠারতো আকাশের হাজার ট্যারা চোখের মত, কোনদিন উঠত চাঁদ। আর ওই মুখগুলি—মধ্যবিত্ত আর চাষা ভূষা—ওই মুখগুলি আমার মধ্যে মুখর অনুভূতি হয়ে চ্যাঁচাতো—ভাষা দাও—ভাষা দাও।" (**গল্প লেখার গল্প**)

মাণিকবাবু ভাষা দিয়েছিলেন। তাঁর "পুতুল নাচের ইতিকথা", "পদ্মানদীর মাঝি" সেই সাক্ষ্য বহন করছে। 'প্রাগৈতিহাসিকে'র ভিখু, 'পদ্মানদীর মাঝি'-র হোসেন, 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'-র গগন—এরা প্রত্যেকেই জীবনের এক একটি অজ্ঞাত, অপরিচিত দরজা খুলে দেয়। গগন যখন বলে—

"এ লড়ায়ে মোরা মরব। মোদের ছেলে-পুলেরা সত্যযুগ করবে।" তখন স্বভাবতঃই এই দুঃসাহসিক বৈপ্লবিকতার ছোঁয়ায় পাঠকমন বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়। "শহরতলী" উপন্যাসের যশোদা যখন বলে—"ভদ্রলোক কাকে বলে জানো না? চাষা মজুরকে যারা ঘেন্না করে, বড় লোকের পা চাটে, ন্যাকা ন্যাকা কথা কয়, আধপেটা খেয়ে দামী দামী জামা কাপড় পরে, আরাম চেয়ে চেয়ে ব্যারামে ভোগে, খালি নিজের সুখ খোঁজে, মান অপমান বোধটা থাকে টনটনে, কিন্তু যত বড় অপমান হ'ক দিব্যি সয়ে যায়, কিছু না জেনে সবজান্তা হয়।" তখন এর চাইতে ভাল ব্যাখ্যা 'ভদ্রলোক'-দের সম্বন্ধে আমরা দিতে পারি না। চিরাগত সংস্কারকে চূর্ণ করে, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকারের লক্ষণ নির্দেশ করে, যৌনতার মুখোসে সত্যকে আবৃত না করে মেহনতী মানুষের জীবনসংগ্রামের বলিষ্ঠ ও সার্থক প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করার গৌরব মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এরপর কিশোর কবি সুকান্তের আবির্ভাব। তাঁর বিদ্রোহ ঘোষিত হল সমস্ত শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে, সমস্ত অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, সমস্ত মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে। বিপ্লবী কবি সুকান্ত দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ—

"দেখবো, ওপরে আজো আছে কারা,
খসাবো আঘাতে আকাশের তারা
সারা দুনিয়াকে দেবো শেষ নাড়া
ছড়াবো ধান।
জানি রক্তের পেছনে ডাকবে সুখের বান।'

শ্রেণীশত্রুর প্রতি তিনি ক্ষমাহীন ঃ—

"প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা
ভেঙেছিস ঘর বাড়ী
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে কখনো ভুলতে পারি।
আদিম হিংস্র মানবিকতার আমি যদি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবোই।"

সুকান্তর অকালমৃত্যুতে বাংলাসাহিত্য অপূরণীয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাঁর সংগ্রামীর চেতনার আগুনে অনুপ্রেরিত হয়ে হাজার সুকান্ত জন্মগ্রহণ করবে– এ বিশ্বাস আমাদের আছে। বহু তরুণ লেখক এগিয়ে এসেছেন

প্রগতিশীল পরীক্ষানিরীক্ষার চিন্তাধারা নিয়ে সংগ্রামকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য। তাঁরা জনসাধারণের জীবনের শরিক হয়ে, তাঁদের উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ করে, তাঁদের সমপর্যায়ত্ব অর্জন করার জন্য গ্রামে গঞ্জে, কলকারখানায় ও খনি ইত্যাদি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করছেন। এঁদের রচনায় রূপলাভ করছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে জনসাধারণের গৌরবময় সংগ্রামী ভূমিকা।

অপরদিকে এই বিপ্লবী সাহিত্যের কণ্ঠরোধের জন্য সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা থেকে আমদানী হ'চ্ছে যৌন অশ্লীলতায় ভরপুর গাদা গাদা উপন্যাস, প্রবন্ধ, সচিত্র মাসিক পত্র ইত্যাদি। এরই নাম দেওয়া হ'চ্ছে 'বাস্তবতা', এই নাকি আমাদের সমাজের সংস্কৃতি! এই অবক্ষয়ী সংস্কৃতির ভগ্নদূত কিছু বুদ্ধিজীবী তাঁদের অশালীন, অশ্লীল সাহিত্য চর্চার নাম দিয়েছেন "স্বাধীন শিল্পকলা"! এঁদের বিকৃত জীবনাদর্শের অপর নাম নাকি "শিল্পীর স্বাধীনতা"! এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান মাও সেতুঙের ইয়েনান বক্তৃতার প্রসঙ্গ মনে পড়ে, যেখানে তিনি বলেছেন, "যে বুদ্ধিজীবিরা মনের দিক থেকে বদলালো না তারা নোংরা; চূড়ান্ত বিচারে শ্রমিক-কৃষকেরা সব চেয়ে পরিষ্কার মনের লোক এবং যদিও তাদের হাত ময়লায় ভরা আর পা গোবর ল্যাপটানো তারা আসলে বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবিদের চেয়ে অনেক বেশী পরিষ্কার।" একথা যে কতবড় সত্যি তা ঐ তথাকথিত অভিজাত বিদগ্ধ লেখকদের (বুদ্ধদেব বসু, সমরেশ বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদির) লেখা পড়লেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিপ্লবী চেতনাকে সর্বপ্রকারে দমিয়ে দেবার এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী লেখক সমাজ গর্জে উঠেছেন। জনতার কাছে আজ কে শত্রু কে মিত্র, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আজ নকশালবাড়ীর রক্তাভ অগ্নিচেতনায় উজ্জীবিত হয়ে শ্রীকাকুলাম, লখিমপুর, চম্পারণ, মুসাহারী, গোপীবল্লভপুরে কৃষিবিপ্লবের জয়যাত্রার সূচনা হয়েছে। আজ লেখক সমাজের কাছে আমাদের আশা অনেক। এই মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবেই লেখনীকে ব্যবহার করবেন তাঁরা। মার্কসবাদী শিল্পীর অন্যতম কর্তব্য এই সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে আঘাতের পর আঘাত করে একে গুঁড়িয়ে দেওয়া। তাই যে বুর্জোয়া সংস্কৃতি এই সমাজব্যবস্থা টিঁকিয়ে রাখার পক্ষে, তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন আমাদের প্রগতিশীল শিল্পীবৃন্দ। নূতন দিগন্তের আভাস পাওয়া যাচ্ছে ইতিমধ্যেই। এই সংগ্রামী চেতনার কণ্ঠরোধের জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং শোধনবাদীরা যত অপচেষ্টাই চালিয়ে যাক না কেন, জয় আমাদের হবেই! নতুন দিনের জন্ম আমরা দেবোই!

আজকের বাংলা নাটক নিয়ে

সুদীপ্ত রায়
তৃতীয় বর্ষ, পদার্থ বিদ্যা

মানুষকে একটি সামাজিক জীব বলা হলে বোধ করি কবি, সাহিত্যিক শিল্পীরাও তার থেকে বাদ পড়েন না ; কারণ যে কোন শিল্পী বিশেষত সাহিত্যিক, নাট্যকার, তা তিনি যতই অসাধারণ হোন না কেন, অন্তত এখন পর্যন্ত তার উপজীব্য মানুষ ও তার বিচিত্র অনুভূতি, জীবন ও সমাজ। সচেতন অথবা অচেতন ভাবে প্রত্যেক শিল্পীই তার পারিপার্শ্বিক সমাজ পরিবেশ ও সমসাময়িক ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের দ্বন্দ্ব দ্বারা প্রভাবিত। সেন্টেবুভে ও তেইনের মত আমরাও বিশ্বাস করি, "Literary production is not distinct or at least separable from the rest of man and human organisation." প্রত্যেক শিল্পীরই একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে—সাধারণ মানুষ তাদের কাছ থেকে সমাজসচেতনতা আশা করেন। একটি বলিষ্ঠ গতিশীল গণ-মাধ্যম হিসাবে স্বভাবতই এই দায়িত্ব নাটক ও নাট্যকারদের অনেক বেশী। আজকের সমাজের অন্যায়, অবিচার অসাম্যের বিরুদ্ধে গনমানসে কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকের বাংলা নাটকের মূল্যায়ন করা উচিত।

এর জন্যে প্রথমেই আমাদের গণতান্ত্রিক (?) দেশের উদার সমাজের বর্তমান অবস্থার দিকে চোখ ফেরানো যাক। তথাকথিত স্বাধীনতার পর বিপুল উন্নতির আলাদীনের প্রদীপের মত অসম্ভব প্রতিশ্রুতিগুলো সব হারিয়ে গেছে,

বাংলা তথা ভারতবর্ষে দ্রুত দৃশ্যপট পরিবর্তন হয়েছে, পাল্টে গেছে মূল্যবোধ আর সমাজ চেতনার ধ্যানধারণা, ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক সমাজের ভাঙ্গন হয়েছে দ্রুততর। এক দৃশ্য ও অদৃশ্য সংগ্রামের প্রস্তুতি চলেছে ক্ষেতে-খামারে, কলকারখানায়, যুবসমাজে—অপরিসীম দারিদ্র্য, শোষণ আর উপেক্ষার মুখে দাঁড়িয়ে।

আজকের অবস্থা অস্থির ও ভয়াবহ ; ভবিষ্যত অনিশ্চিত ও অন্ধকার। ঠিক এই মুহূর্তে বাংলা নাটকের ভূমিকা সম্বন্ধে আমাদের আশা ছিল অপরিসীম। শ্রেণী সংগ্রামের চরিত্র, সমাজের নির্মম আপোষহীন ভয়ঙ্কর চিত্র নাটকের প্রাণবান মাধ্যমের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন ছিল অনেক ; নিরক্ষর কিন্তু স্পর্শ-কাতর, নিপীড়িত কিন্তু শ্রেণী অচেতন অনেক মানুষের মধ্যে শ্রেণী সচেতনতা, বিদ্রোহের উন্মাদনা জাগানোর কাজের দায়িত্ব ছিল গুরুতর। আমরা আশা করেছিলাম ১৯৪১-৪২-এর আলোড়ন সৃষ্টিকারী গণনাট্য আন্দোলনের পুনরুজ্জীবন, বিজন ভট্টাচার্য্যের 'নবান্ন'-এর মত গ্রামে নগরে সাড়া জাগানো নাটকের আবির্ভাব। কিন্তু কলকাতার অধিকাংশ পেশাদারী বা অপেশাদার অথবা শৌখীন নাট্যসংস্থাগুলির গত কয়েক বছরের অধিকাংশ নাটকের ধারা আমাদের হতাশ করেছে।

এইসব নাট্য প্রচেষ্টার দিকে তাকালে কোথাও চোখে পড়বে না সমস্যার যে একটা immediacy বা তাড়া আছে তার লক্ষণ। সেইরকম সমাজ ও শ্রেণী সচেতন নাটকের খোঁজ পাওয়া কষ্টকর যাতে পরাজয়ের হতাশার সুর ভেদ করে শোনানো হয়েছে বলিষ্ঠ জীবনের বোধন। বরং পচনশীল সমাজের বিরুদ্ধে জেহাদের বদলে আমরা শুনতে পাই নাগরিক সভ্যতার বহুদিনকার পচা সেন্টিমেন্টের মরাকান্না। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, যেমন ঋত্বিক বাবুর 'জ্বালা' নাটকটি—যদিও নাটকটির শুরু নিষ্ঠুর শোষণের কাছে পরাজয় স্বীকার করে আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে—শেষে গিয়ে আমরা পাই বলিষ্ঠ আশার সুর যেখানে নিপীড়িত মানুষের ক্ষমতায় কোন সংশয় নেই, সাফল্যের নিশ্চয়তায় নেই অবিশ্বাস —দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করা হয়েছে আগামী দিনের মেহনতী মানুষের জোটবদ্ধ লড়াই-এর কথা। কিন্তু দুঃখের কথা এইরকম মুষ্টিমেয় কয়েকজন নাট্যকার-এর নাটক ছাড়া আজকের অধিকাংশ নাটকই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এই অর্থে যে

স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবির রসালোচনার উপকরণ জোগান ছাড়া বৃহত্তর শ্রমিক কৃষক সমাজে তা কোন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নি। এবং মজার কথা হল এই যে অধিকাংশ নাট্যকারই গণনাট্য আন্দোলন সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন না, বরং 'সৎনাট্য' 'নবনাট্য' ইত্যাদি গালভরা নাম দিয়ে তাদের সাধের কোমল-অবয়ব নাট্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। অথচ এরাই আবার প্রচারের ঢক্কানিনাদে এটা জনসমক্ষে কবুল করতে চান যে বাংলাদেশের (কলকাতার?) রঙ্গমঞ্চে আঙ্গিক, form, সেট-পরিকল্পনা ইত্যাদির পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে তারা নবীন বাংলা নাটককে ভয়ঙ্কর ভাবে প্রগতিশীল, যুগধর্মী ও বাস্তব করে তুলেছেন! অবশ্য তথাকথিত frustration-এর বিকৃত মানসিক 'হিপিতত্ত্ব' যদি হয় যুগধর্ম; শ্রমিক অশান্তি, লক-আউট, ঘেরাও, গ্রামে গ্রামে কৃষকের লড়াই, স্কুল কলেজে বিক্ষোভ এবং রাস্তার মিছিলের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে সংগ্রামবিমুখ নায়কের মুখে মুক্তি-তত্ত্ব, আনন্দ-তত্ত্বের অমৃতবাণী শোনানোটা যদি বাস্তবতা হয় এবং 'কিছুতেই কিছু হইবে না, অতএব কিছুই করিবার নেই'—এই নেতিবাচক মনোভাব থাকাটা যদি প্রগতি হয় তবে অবশ্য বলার কিছু নেই। সমাজের সমসাময়িক অবস্থার সঠিক প্রতিফলন একটি বাস্তব ও যুগধর্মী নাটকে থাকবে এটা আশা করা কি ভুল? অবস্থা দেখে মনে হয় আজকের অধিকাংশ নাট্যকারের যুগধর্ম দশ বিশ বছর অথবা তারও আগে বিদেশে যে সব নাটক হয়ে গেছে তার প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পর্যায়ে পরিশোধিত 'মৌলিক' নাটকের নাট্যরূপ দেওয়া। বিদেশের যা কিছু মহৎ তা নিশ্চয়ই আমাদের নাট্য আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করার কাজে ব্যবহৃত হবে—কিন্তু সেটা যদি উদ্দেশ্যহীন হয়, অক্ষমতাকে ঢাকবার জন্য হয় কিংবা ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত ভাবে আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি, চিন্তাধারা থেকে বিছিন্ন বিদেশী আবর্জনা বহন করে নাট্য আন্দোলনকে বিপথগামী করার জন্য হয়, তবে তাকে কখনই সহ্য করা উচিত নয়।

তাই আজ কলকাতাকেন্দ্রিক অধিকাংশ নাট্যপ্রচেষ্টাকে বৃহত্তর সমাজের সাথে সংযোগহীন একটা ভাববাদী আন্দোলন বলা যায়। এ সম্বন্ধে ঋত্বিক বাবুর একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য, "মনে হয় ইহারা সম্পূর্ণ মেকী এবং কৃত্রিম। ইহাদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা করার মত কোনও সহানুভূতি আমরা খুঁজিয়া পাইতেছিনা।—মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত না থাকিলে তাহা শিল্প হয় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না, বর্ত্তমানে যাহা

দেখিতেছি, তাহার অধিকাংশই মানুষের সঙ্গে সংযোগ রাখিবার চেষ্টা করে বলিয়া মনে হয় না।"

অবশ্য অনেকেই মানুষের সাথে একটা যোগ রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই শহুরে বুদ্ধিজীবির দৃষ্টি দিয়ে দেখার ফলে কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক সমস্যা ইত্যাদির অনেকটা সরলীকৃত এবং বিকৃত একটা রূপ নেয়। (যেমন থিয়েটার ইউনিটের 'জন্মভূমি' অথবা নাটুকে দলের 'ক্রীতদাসে'।) এবং যদিও যে কোন নাটকে "The whole is more important than any part" এই ধরণের নাটকগুলিতে কিন্তু ঠিক এই সামগ্রিকতারই অভাব থাকে।

কিন্তু কলকাতার প্রধান দর্শক আকর্ষণকারী এবং স্বনামখ্যাত চারটি নাট্য-গোষ্ঠী 'নান্দীকার' (অজিতেশ বন্দ্যোঃ) 'বহুরূপী' (শম্ভু মিত্র), 'শৌভনিক' (গোবিন্দ গাঙ্গুলী) এবং কলকাতার উল্লেখযোগ্য গণনাট্যসংস্থা 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' (উৎপল দত্ত)-এর কথা না বললে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

'বহুরূপী', 'নান্দীকার' এবং 'শৌভনিক' বাংলার নাট্য জগতে বলিষ্ঠ অভিনয় ও টিমওয়ার্ক, মঞ্চসজ্জার অভিনবত্বে এবং আঙ্গিকের পরীক্ষা নিরীক্ষার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'বহুরূপী' প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি সাঙ্কেতিক নাটক এবং 'শৌভনিক'-এর অধুনা প্রযোজিত কয়েকটি 'মৌলিক' নাটক ব্যতিরেকে এদের অধিকাংশ নাটকই বিদেশী নাটকের সরাসরি অনুবাদ অথবা ছায়া অবলম্বনে লেখা। সফল নাটক হিসাবে নাম করলেও (নান্দীকার–এর 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' থেকে শুরু করে 'শের আফগান' বহুরূপীর 'রাজা অয়দিপাউস' কিংবা শৌভনিকের 'আন্তিগোন') বর্ত্তমানের অস্থির সামাজিক পটভূমিকায় তার প্রভাব ও মূল্য কতখানি তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। নাটকের মান বজায় রাখতে যথেষ্ট উৎসাহী হলেও সে উৎসাহ যতটা form এবং কলাকৌশলের কারিকুরি দেখানোতে ততটা নাটকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ content বা বক্তব্যের দিকে নয়। যদিও বাংলা নাট্যজগতে experiment-এর দাবী এরা করতে পারেন; সেই experiment সমাজের বৃহত্তম শরিকদের সমস্যা নিয়ে নয় বরং নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মন জয়কারী successful drama-এর দিকেই তাদের লক্ষ্য বেশী। অবশ্যই এই ত্রয়ীর প্রতিটি নাটকের সাফল্যের পিছনে পরিচালকের

সতর্ক এবং শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী, অনবদ্য team work-ই মূল কারণ। কিন্তু আক্ষেপের কথা এই যে শক্তিশালী নাট্যগোষ্ঠী হিসাবে তাঁরা সমাজের প্রতি দায়িত্ব সচেতনভাবে পালন করেন না। নাট্য প্রচেষ্টায় এঁরা এঁদের private mood-এর দ্বারাই পরিচালিত। কাজেই এঁদের আভিজাত্যের পতাকাবাহী রথ কলকাতার মসৃন রাজপথে বিদেশী চাকায় গড়গড়িয়ে চললেও বৃহত্তর বাংলার বাস্তবের বন্ধুর, রূঢ় পটভূমিকায় সেই গতি অচল।

অথচ ভাবতেও অবাক লাগে আজকের অনেক প্রথিতযশা অভিনেতা ও নাট্যকারই ১৯৪০-৪২ সালের প্রচণ্ড উদ্দীপনাময় গণনাট্যআন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন। সেই নাট্য আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ ফসল বিজন বাবুর ১৩৫০-এর মন্বন্তর নিয়ে লেখা নাটক "নবান্ন" মৈমনসিংহের সারা ভারত চাষী সম্মেলন এবং পরে মেদিনীপুরে অনেক চাষীর মধ্যে একটা বিপুল সাড়া জাগায়। সেই নাট্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বলিষ্ঠ অভিনেতা খ্যাতিমান পরিচালক শ্রদ্ধেয় শ্রীশম্ভু মিত্রের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা, 'নবান্ন'-এর মত নাটকের প্রয়োজন কি ফুরিয়ে গেছে? একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম হিসাবে শোষণের বিরুদ্ধে অনেক দিশাহারা, অসহায়, ছন্নছাড়া মানুষকে জাগিয়ে তোলার কাজে নাটকের দায়িত্ব কি আজ আরও বেশী নয়? তিনি কি ভাবছেন জানি না, কিন্তু একটি 'মৌলিক' নাটক 'এবং ইন্দ্রজিৎ'-এর রচয়িতা বাদলবাবুর বক্তব্য তো অনেক সরাসরি। নাট্যকার নাকি আমাদের অগ্নিগর্ভ সমাজ থেকে চরিত্র ও উপাদান খুঁজে পাচ্ছেন না। তার আক্ষেপ "কাদের নিয়ে নাটক করব!" সত্যিই তো বাদলবাবুর মত প্রতিভাবান নাট্যকারের পক্ষে তেভাগার ভূমিহীন চাষীর জমির লড়াই তো নাটকীয় উপাদান হতে পারে না, যেমন হতে পারে না তার নাটকের চরিত্র ৫০ টাকা ৫২ পয়সা মাইনের চাকরী যাওয়া শ্রমিকের দুঃসহ প্রতিকূলতার মধ্যে বেঁচে থাকার অসহায় প্রচেষ্টা! তার এই নাটকের বুদ্ধিদীপ্ত কিন্তু ফাঁকা কথার কৃত্রিম রোশনাই অথবা 'দুর্ধর্ষ' আধুনিক কবিতা কয়েকটির অভিনবত্ব কবিত্বহীন, বৈচিত্র্যহীন সাধারণ মানুষের অতিবাস্তব খেটে খাওয়া জীবনকে আলোড়িত না করলেও কলকাতার অনেক সুখে থাকা ইন্দ্রজিৎ-এর প্রভূত রোমাঞ্চ শিহরণের কারণ হয়েছিল। নব্য সংস্কৃতির নামে কিছু শহুরে বুদ্ধিজীবি আজ যেভাবে সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করে চলেছেন তা সত্যিই দুঃখজনক। এই প্রসঙ্গে ঋত্বিকবাবুর একটি মন্তব্য মনে পড়ে,

"আজকের ন্যাকামী আমাদের কাছে অসহ্য লাগে। এগুলি শিল্প নয়, বেশীর ভাগই বিদেশীদের কাছ থেকে সংগৃহীত। এই করে কতখানি ডাল গলবে তা বোঝা মুস্কিল।"

তবে আশার কথা এই যে আজকের কলকাতার অধিকাংশ মঞ্চের ভাঁওতাবাজী ও অসারতা থেকে দূরে থেকে লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপের মত দু-একটি গণনাট্যসংস্থা একটি সুচিন্তিত line of action নিয়ে আজকের শ্রেণী সংগ্রামের বলিষ্ঠ নাট্যরূপ দেওয়ার কর্তব্যে নিজেদের নিয়োগ করেছেন। তথাকথিত রাজনৈতিক বক্তব্য থাকা সত্বেও বাস্তবের কঠিন ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে নাটক কতখানি সার্থক ও রসোত্তীর্ণ হতে পারে উৎপল দত্তের 'অঙ্গার' 'তীর' প্রভৃতি তারই নিদর্শন। বাস্তব মঞ্চ পরিকল্পনায় এঁরা অপূর্ব দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

আজ বাংলাদেশে নাটক করার একটা জোয়ার এসেছে—মফস্বলও তার থেকে বাদ পড়েনি। দেশজুড়ে যে সামগ্রিক অস্থিরতা ও অনিশ্চিত পরিস্থিতি তাতে নাট্যআন্দোলনের সঠিক এবং বলিষ্ঠ রূপদানের জন্য মফস্বলের বহু অজানা, ক্ষুদ্র নাট্যসংস্থা কলকাতার মুখ চেয়ে ছিল, নাট্যআন্দোলনের নেতৃত্বের ভার অভিজাত গোষ্ঠীগুলির উপরই ছিল—কিন্তু নাট্যআন্দোলনের ক্ষেত্রে কলকাতার বুজরুকি এদের হতাশ করেছে; এদের উন্নাসিক সওয়ারির জেল্লা অনেকদিন বাংলার নাট্যআন্দোলনকে আচ্ছন্ন করে রাখলেও আজ তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত। মফস্বল ও গ্রাম বাংলার নাট্যআন্দোলন বলিষ্ঠ পদক্ষেপে তার নিজস্ব পথ খুঁজে নেবার চেষ্টা করছে এটা অত্যন্ত আশার কথা। যুগোপযোগী ভাবেই এঁরা ক্ষুদ্র কিন্তু প্রাণবন্ত ও বেগবান একাঙ্কিকা নাটকের রূপদানের দিকে ঝুঁকেছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা বাংলা নাটকে বিদেশীয়ানায় তাঁরা আর সম্মোহিত নন। একজন সমালোচকের কথায় "বিদেশী পল হ্যারিসনের সমস্যার চাইতে দেশীয় পরিমল হরিসাধনের সমস্যা তাদের কাছে অধিকতর জরুরী। এমনকি তারা পলকে পরিতোষ অথবা হ্যারীকে হরিপ্রসন্নে রূপান্তরিত করতেও নারাজ।" মফস্বল বাংলার নাট্যআন্দোলনের এই সমাজ সচেতনতা সত্যিই সম্ভাবনাময়।

আজকে দিকে দিকে আওয়াজ উঠুক, মঞ্চে নাটকের নামে বিলাসিতা,

যৌনতা ও বিকৃত সংস্কৃতি প্রচারের অপচেষ্টা বন্ধ হোক; স্তব্ধ হোক বিদেশী নাটকের ছায়ায় দেশী নাটকের কায়া আবিষ্কারের 'মৌলিক' প্রয়াস। দেশের বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে সার্থকভাবে রূপায়িত করবে বৈপ্লবিক নাটক। সমাজ অচেতন নাট্যকারদের আঙ্গিক ও form-এর স্বপ্নালু পরীক্ষা না হয় অভিজাত পাড়ার ক্লাবঘরেই স্থান নিক। আমাদের এবং আপামর বাঙালী জনসাধারণের আশা কলকাতার সৌখীন নাট্যআন্দোলন ভেসে যাবে গণনাট্য আন্দোলনের জোয়ারে। বাংলাদেশের গ্রাম নগর ভেদ করে বেরিয়ে আসবে সেই নাটক যার নায়ক চরম অত্যাচার, উপেক্ষা ও প্রতিকারহীন শোষণের মুখে দাঁড়িয়ে শান্তি ও অহিংসার হরিনাম জপ করে না, বরং সে জানে রক্তের রং লাল, চোখের জলের স্বাদ নোনতা, আর অপমান, দারিদ্র্য ও ক্ষুধার বড় জ্বালা। উত্তাল জনবিক্ষোভের সাথে একাত্ম হয়ে, সাধারণ মানুষের ব্যাপক ও গভীরতর সমস্যার সাথে জড়িত থেকে নাটক হয়ে উঠবে গতিশীল, সমাজ সচেতনতায় সার্থক ও অনন্য।

বাংলা নাটকের আগামী 'নবান্ন' 'মূক যারা দুঃখেসুখে, নতশিরে স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে' তাদেরই আনন্দকল্লোলে ভরে উঠবে এটাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

"...এ ঘটনা সব সময়েই ঘটে যে, সোস্যালিষ্টদের নিয়ে গঠিত সর্ব-প্রকারের কোয়ালিশন মন্ত্রী সভাই, এমন কি এই সোসালিষ্টদের মধ্যে কেউ কেউ যদি সম্পূর্ণ সৎ ব্যক্তি হ'ন তাহলেও, হয় অকেজো অলংকার হয়ে দাঁড়ায় অথবা সরকারের পক্ষে জনগণের ক্রোধকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার আবরণ অথবা সরকারের হাতে জনগণকে ধাপ্পা দেবার যন্ত্রে পরিণত হয়।"

—লেনিন

[সংকলিত রচনাবলী (ইং), মস্কো থেকে প্রকাশিত, ২৫ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭-৩৬৮]

ভারতের কৃষিবিপ্লব এগিয়ে চলেছে

বিভিন্ন পত্র পত্রিকার দর্পণে

দীপক পালিত
দ্বিতীয় বর্ষ, অর্থনীতি

নকশালবাড়ী—বিপ্লবী জনগণের রক্তেরাঙা একটা পথের নিশান। যে নিশান শোষণ-ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা থেকে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ার পথে দিকনির্ণয় যন্ত্রের কাজ করছে। আগামী দিনের লাল সূর্যধৌত লাল পৃথিবীর উদ্‌বোধনে একটি কঠিন শপথ **নকশালবাড়ী**। **মার্কসবাদ-লেনিনবাদ** এবং **মাও-সেতুঙ্‌** এর চিন্তাধারার বাস্তব প্রয়োগ **নকশালবাড়ী**। নকশালবাড়ীর বীরকৃষক জনগণ শতাব্দীর সামন্ততান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদীর নিপীড়নের বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন গ্রাম থেকে সামন্ত শোষকদের উচ্ছেদ করে শ্রমিক কৃষকের শাসন কায়েম করার পথকে পরিষ্কার করেছেন—বিপ্লবী লাল ঘাঁটি গড়ার পথকে উন্মুক্ত করেছেন। মহান ভারতীয় জনগণের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব-এর প্রথমস্তর কৃষিবিপ্লবের গুরুত্বকে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োগের মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছে **নকশালবাড়ী**। নকশালবাড়ীর বীরকৃষক জনগণ শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে লড়াই করেছেন **রাষ্ট্রক্ষমতার জন্যে সশস্ত্র শক্তির** মোকাবেলা করেছেন **সশস্ত্র শক্তি** দিয়েই।

সুতরাং এহেন বিপ্লবী-লড়াই যে প্রতিবিপ্লবীদের 'রাতের ঘুম' কেড়ে নেবে এতে আর অশ্চর্য্যের কি আছে? নকশালবাড়ীর নামে আজ প্রতিবিপ্লবীরা আতঙ্কিত। প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস আর **"বিপ্লবের নামাবলী"** গায়ের নয়া-সংশোধনবাদীরা (সাইনবোর্ডের মার্কসবাদীরা) একজোট হয়ে এই বিপ্লবের ভ্রূণকে

অঙ্কুরে বিনষ্ট করার জন্যে তাদের অশুভ হাতকে বাড়িয়েছে। নকশালবাড়ীর কিষানী মা আর তাঁদের দুধের বাছাদের (তারা যেন আগামীদিনে বিপ্লবী না হয়ে ওঠে) হত্যা করে "প্রতিক্রিয়াশীল মোর্চা" (শাসক তথা শোষক শ্রেণীর ভাষায় 'যুক্তফ্রন্ট') নকশালবাড়ীর বিপ্লবী স্ফুলিঙ্গ কে নিভিয়ে দেওয়ার অপপ্রচেষ্টা করেছে। কিন্তু দুনিয়ার বিপ্লবী জনগণের মহান নেতা মাও সেতুঙ্ আমাদের শিক্ষা দেন—"যেখানেই নিপীড়ন, সেখানেই প্রতিরোধ"। নকশালবাড়ীর বীর কৃষক জনগণ দুর্জয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলে মহান মাও-এর উক্তির সত্যতা প্রমাণ করেছেন—"প্রতিক্রিয়াশীলেরা দেখতে যত ভয়ঙ্করই হোক না কেন, আসলে তারা কাগুজে বাঘ।"

তাইত নকশালবাড়ীর আন্দোলনের সময় দেখেছি ভারতের শোষক-শ্রেণীর কী ভীষণ আতংক! তথাকথিত 'কমিউনিস্ট', 'মার্কসবাদী' ভেকধারী শোষকশ্রেণীর অনুচরদের 'তত্ত্বকথা' ও দমন-পীড়নকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গেছে নকশালবাড়ী। নকশালবাড়ীর স্ফুলিঙ্গ মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে ভারতের আটটি প্রদেশে (অন্ধ্র, উড়িষ্যা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, বাংলা) আজ ছড়িয়ে পড়েছে। অচিরেই সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এ স্ফুলিঙ্গ দাবানল হয়ে জ্বলবেই।

নকশাল বাড়ীর সাতজন কিষাণী মা ও তিনজন শিশুকে হত্যা করে 'জনগণের সরকার'-এর 'মার্কসবাদী' পাণ্ডারা চীৎকার করে বলে উঠেছিল, 'নকশালবাড়ী খতম হয়ে গেছে।' শোষকশ্রেণীকে আশ্বাস দিতে বলেছিল, 'আমাদের খালি গদিতে বসিয়ে দাও। দেখবে, আমরা যা পারি, কংগ্রেসীরাও তা পারে না।' কিন্তু শোষকশ্রেণী কি তাদের এই 'বামপন্থী' পদলেহীদের আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হতে পারছে? বোধ হয় নয়।

নকশালবাড়ীর ঘটনার একবছর পরে কেরালার বীর কৃষকরা ওয়াইনাদে এক বীরত্বপূর্ণ বিদ্রোহ করেন। নামবুদ্রিপাদ সরকার তাদের ওপর প্রচণ্ড দমন পীড়ন চালায়। কিন্তু শোষকশ্রেণীর আতংক ত কমছে না! আর এক 'বিপদ' দেখা দিল অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলায় ও তার আশেপাশে। এখানকার কৃষকরা মাও সেতুঙের চিন্তা ধারায় সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের পথে অগ্রসর হ'লেন। শ্রেণীশত্রু জমিদারদের খতম করতে শুরু করলেন। শোষকশ্রেণীর আতংক বাড়ল। এই আতংক ফুটে উঠেছে তাদের মুখপত্র **Statesman**-এর রিপোর্টে। ১৫ই

ডিসেম্বর, '৬৮ 'স্টেট্‌স্‌ম্যানে এ সম্পর্কে যে রিপোর্ট বেরোয় এখানে আমরা তার প্রায় সবটাই তুলে দিচ্ছি।

Naxalites Training Tribals In Andhra Pradesh

From Our Special Representative in South India

MADRAS, Dec. 14—The quick collapse of the Wynad Naxalites' attempt to stage a revolution has put out the bushfire of violent revolt in Kerala at least for the time being. But a much more dangerous uprising seems to be in the offing elsewhere in South India—in the densely forested mountains of the Eastern Ghats on the Andhra-Orissa border—and the Cetre can ill afford to dismiss it as another mistimed adventure by a handful of misguided Marxist militants.

For the past 13 years the Communists have been steadily consolidating their hold over the simple, largely uneducated. Girijan tribesmen of the Srikakulam reserve. As a result Naxalite leaders of Andhra Pradesh have succeeded in weaning away virtually the majority of the 80.000 tribesmen of the area to their cause.

Today, the State Government's writs do not run in scores of isolated mountain hamlets where tribesmen are being trained in guerrilla tactics and use of arms by a team of fanatic extremists led by a middle-aged former schoolteacher. Since October last year the Girijans under his leadership have carried out occasional raids on landlords and the police. Earlier this year, on March 4, the police shot down two Marxist tribals in an encounter at Pedakharija village. Last month the tribesmen were again on the warpath and there were at least four raids on landlords in different parts of the tribal reserve, during which property worth about Rs. 50,000 was stated to have been looted.

From all available reports further trouble can be expected not-withstanding the strengthening of the already substantial police force in the reserve. In fact, special armed police had moved into the area last February but their daily operations have not only failed to check the revolt but seem to have helped the Marxists to further alienate the tribesmen from the Government. This reporter, who visited this tribal belt earlier this year, found the situation pretty tense with the Girijans in a sullen and uncooperative mood. Today, according to reliable reports, the position is far worse and the Naxa-

lites seem to have fully established themselves to start a revolt. The failure of the police to round up the ring-leaders despite eight months of intensive hunt in the mountains is clear enough proof of tribal support for them.

There are also disturbing reports of the Naxalites trying to fan the fires of the tribal discontent in the adjoining Vishakhapatanam reserve. About 20 hard-core Naxalites from Guntur and Krishna districts have recently moved to Gudam and Chintapalli taluks to train tribesmen in guerrilla tactics.

These developments are not unknown to the State authorities but the police in the area have found themselves helpless not necessarily because of the mounting hostility of the tribesmen towards them....if the reports of the resultant difficulties experienced by the police in the Srikakulam area are true. Hyderabad can hardly escape the accusation of negligence in tackling the tribal revolt.

'স্টেটসম্যান'-এর রিপোর্টার বেশ 'বিশ্বস্ততার,' সঙ্গেই শোষকশ্রেণীকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। কিন্তু শাসকশ্রেণীর সাধ্য কি এই বিপ্লবের গতিরোধ করার! আমাদের মহান নেতা সভাপতি মাও সেতুঙ বলেন, "প্রতিক্রিয়াশীলেরা ইতিহাসের রথ-চক্রের গতি রোধ করার জন্য যত অপচেষ্টাই করুক না কেন, আগে বা পরে, বিপ্লব অবশ্যই ঘটবে এবং তা অনিবার্য ভাবে বিজয় লাভ করবে।" তাই শ্রীকাকুলামকে ঠেকিয়ে রাখা যায় নি। কমিউনিস্টপার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র নেতৃত্বে এখানকার বিপ্লবী জনতা শ্রেণীশত্রুদের নির্মূল করে প্রায় তিনশ' গ্রামে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করেছেন। অভ্যুদয় ঘটেছে লাল রাষ্ট্রশক্তির। 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' তাই আবার শাসকশ্রেণীকে সতর্ক করে লিখছে,

Naxalite Movement Gaining Momentum In Andhra

Ftom Our Special Representative In South India

MADRAS, July 4.—The furore over the Telengana issue seems to have diverted public attention from a much more dangerous development in Andhra Pradesh—the alarming increase in Communist violence.

From the salwood forests of Srikakulam to the scattered mountains of Telengana, Naxalite bands have of late been extremely

active. Raids on houses of landlords and the ambushing of police patrols have become regular features of what the Naxalites themselves publicly proclaim to be the beginning of a violent guerrilla struggle for a "proletarian revolution.

Judging from what is happening in Andhra Pradesh today, the Naxalite movement can no longer be dismissed as isolated acts by a few militant Marxists. In Srikakulam district, the Naxalites are already well established, with virtually all the 80,000 Girijan tribals of the agency under their sway. They are stated to have accumulated an arsenal of about 500 guns in addition to spears, bows and arrows, axes and abundant quantities of explosives. In clashes with rebel bands, police have so far recovered about 250 countrymade guns.

Much more alarming is the slow but steady spread of Naxalite violence to other areas of Andhra Pradesh. A year ago the movement was largely limited to tribal belt of Srikakulam. Today Naxalites are active in at least 19 taluks spread over Visakhapatnam, east and west Godavari, Krishna, Guntur, Nellore, Anantpur, Warangal and Khammam districts.

Over the past few weeks these rebel bands have conducted numerous raids, mainly to secure arms and funds. Their targets are invariably landlords known to possess licensed arms. These raids have further consolidated the movement. Not long ago, the Naxalites were in severe financial troubles.

...Conservative estimates put the value of property looted by the extremists from all over Andhra at well over Rs 1^0 lakhs.

Despite its preoccupation with Telengana, the Andhra Pradesh Government has of late taken note of the Naxalite threat. A senior police officer has now taken over the anti-Naxalite operations and there has recently been some welcome police activity in the mountains of Srikakulam.

But no significant progress has been made in snuffing out the revolt. The Naxalites are known to have perfected their underground apparatus and the authorities are aware of the existence of several "safe" houses in the coastal belt used by the extremists as venues for conferences, resting places for couriers and indoctrination

centres for new recruits. What is surprising is that these misguided sympathizers include school teachers, college principals, lawayers and and even a Ph. D research scholar. Many extremists use false names and codes in correspondence, it is stated.

The latest assessment of Naxalite strength in Andhra is about 9,000. This smaller force does not necessarily represent their real following. With their present concentration in agency areas, the extremists have been able to convert a substantial number of innocent tribesmen. The current agitation is canalized through many front organizations of tribals where seething resentment against the plainsmen has been the mainstay of the revolt.

Money-lenders corrupt officials and acquisitive plainsmen have in fact proved to be the indirect allies of the Naxalites. These are the people mainly responsible for providing rhe Communists with their "ammunition" in the shape of tribal discontent. Usurious rates of interest on loans exploitation of tribal labour, progressive "purchase" of tribals' lands for less than their market value through collusion with crrupt officials and the clever manipulation of several existing tribal welfare schemes to enrich some vested interests. have all made the tribals highly hostile to plainsmen and to established authority.

Anyone visiting the tribal agency areas of Andhra will concede the existence of genuine grievances among the tribesmen and the need for urgent administrative measures to restore their confidence in the Government. While police action against erring tribals indulging in violence may be necessary parallel administrative measure to redress their legitimate grievances are equally essential.

What is needed is a human approach by a team of officials sensitive to the aspirations of this innocent backward community. The present administrative apparatus in the agency areas is too deeply steeped in the lore of fundamental rules to make much headway. Induction of more sympathetic officials into the area is obviously the essential first step in any long-range pacification programme. Unless this is done and that too quickly the present unrest in the tribal, belts of Andhra Pradesh may well get out of control.

'স্টেট্‌স্‌ম্যানের এই রিপোর্টে শ্রেণীশত্রুর আতঙ্ক বেশ ভালভাবেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জোতদার জমিদারদের আশ্বাস দেওয়ারও চেষ্টা করেছে। পার্বতীপুরম্ এজেন্সীর কয়েকটি অঞ্চলকে 'উপদ্রুত' ঘোষণা করে ও পুলিশ মিলিটারি পাঠিয়ে এই 'বিপদের' মোকাবেলা করা যাচ্ছে না। শ্রীকাকুলামের অন্যতম নেতা পঞ্চাদ্রি কৃষ্ণমূর্তিকে অতর্কিতে ছয়জন সঙ্গী সহ ধরে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গেই গুলী ক'রে হত্যা করে তারা। তা সত্ত্বেও এই আগুনকে নেভান যাচ্ছে না। এক কৃষ্ণমূর্তির মৃত্যু হাজার কৃষ্ণমূর্তির জন্ম দিচ্ছে। তাই ভাবনা আরও বেড়ে গেছে শাসকশ্রেণীর। শাসকশ্রেণীর অন্যতম প্রভাবশালী ইংরাজী 'হিন্দু' পত্রিকার রিপোর্টে এই দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে। 'হিন্দু'র ১৮-৮-৬৯ তারিখের রিপোর্টের বঙ্গানুবাদ আমরা এখানে তুলে দিচ্ছি :

"মাসখানেক আগে শ্রীকাকুলাম জেলার হীরামণ্ডলম অঞ্চল থেকে পুলিশ একজন ২৫ বৎসর বয়স্কা নকশালপন্থী মহিলাকে গ্রেপ্তার করে। তিনি দুই সন্তানের জননী। পথপতনম সাবজেলে যে পুলিশ অফিসারটি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল সে তার মাতৃত্বের কাছে আবেদন জানিয়ে বলে, কীভাবে তিনি তার সন্তানদের ত্যাগ করে নকশালপন্থীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। মহিলা জবাব দিয়েছিলেন, "উপবাসী লক্ষ লক্ষ জনতার" তুলনায় তার সন্তানেরা বিলাসিতার জীবন যাপন করছে, অতএব তিনি তার নিজের সন্তানদের চেয়ে "লক্ষ লক্ষ উপবাসী"র কথাই বেশী ভাবছেন।

মাত্র গত বছর হাউস সার্জেনশিপ শেষ করেছেন এমন একজন তরুণ ডাক্তার বোবিলি এলেকায় একটি নকশালী ডাকাতির ব্যাপারে গ্রেপ্তার হয়েছেন। তিনি কেন ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, "এই সব জমি আইনত গিরিজনদের, জমিদাররা তা বেআইনী ভাবে দখল করে রেখেছেন। আমি শুধু জমিদারদের বেআইনী দখল থেকে খাদ্যশস্য কেড়ে এনেছিলাম তার আইনসম্মত মালিকদের অর্থাৎ গিরিজানদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।"

এ এক দুর্বোধ্য রহস্য যে, মেডিক্যাল, ইঞ্জিনীয়ারিং ও আর্ট কলেজগুলি থেকে এবং যেখানে একসময় মার্কসবাদী ছাত্র সংস্থা সক্রিয় ছিল সেইসব হাইস্কুল থেকে দলে দলে ছাত্র চলেছে শ্রীকাকুলাম জেলায় নকশালপন্থী আন্দোলনে যোগদানের জন্য।

নেলোরে একদিন একটি ছাত্র বাড়ী থেকে উধাও হয়ে যায় একখানি

চিঠি রেখে, যাতে শুধু একছত্র লেখা ছিল, "আমি আমার গন্তব্যস্থল শ্রীকাকুলামে যাচ্ছি।" কাকিনাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের একটি ছাত্রীকে সম্প্রতি পুলিস গ্রেপ্তার করেছে। একটি নকশালপন্থী মেডিক্যাল ছাত্রকে ভালবেসে ও তাকে বিয়ে করে সে নকশালপন্থী আন্দোলনে যোগদান করেছে। হোষ্টেলে বসে ছাত্ররা এই আন্দোলনের যে কাহিনী শোনে তাদের কাছে মনে হয় আন্দোলনটি চলছে এক রোমান্টিক আবহাওয়ায়। এমন কি যাদের কমিউনিষ্ট বলা চলে না সেই ছাত্র-ছাত্রীরাও এই আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে এই বিশ্বাসে যে, তারা একটা ন্যায়ের লড়ায়ে যোগ দিচ্ছে।

অন্ধ্রে যখন মার্কসবাদী পার্টি দুভাগ হল, তখন নকশালপন্থীদের সংখ্যা ছিল ৫০০০-এর মত। জানা যায়, নকশালপন্থীদের 'হার্ডকোর' গ্রুপটির সংখ্যা শ্রীকাকুলাম জেলায় ৬০০ থেকে ১০০০ জন।

...প্রচারের দিক থেকে নকশালপন্থীরা নিয়মিতভাবে পুস্তিকা প্রকাশ করে শ্রীকাকুলাম জেলার সহরগুলির বাসিন্দাদের তাদের 'সংগ্রাম' সম্পর্কে অবহিত রাখেন। কোন একদিন ভোর বেলায় এই পুস্তিকাগুলি দেখা যায় ডাকঘরের নিকট বাস ষ্ট্যাণ্ডে কিম্বা গাঁয়ের মাঝখানে চায়ের দোকানে।

...এই নকশালপন্থী প্রচার পুস্তিকাগুলির উদ্দেশ্য সমতল ভূমির গ্রামগুলিতে তাদের দরদীদের মনোবল বাড়িয়ে তোলা, এ থেকে মনে হয় নকশালপন্থীরা নিজেরা তাদের নিজস্ব এক স্বপ্নলোকে বাস করছে। এখন জেলে আটক রয়েছে যে সব নকশালপন্থী (এ যাবৎ প্রায় ২০০০ গ্রেপ্তার হয়েছে) একখানি প্রচার পুস্তিকায়, জামিনের আবেদন করতে ও জামিনে বেরিয়ে আসতে তাঁদের নিষেধ করা হয়েছে, বলা হয়েছে "জনতা তাদের মুক্ত করা পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করুন।" অধিকাশ প্রচার পুস্তিকাতেই বলা হচ্ছে, "তাদের সংগ্রাম হবে দীর্ঘস্থায়ী" যা শেষ পর্যন্ত জয়ী হবেই।

এদের সাফল্যের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। যদিও পাহাড় এলেকা 'এবং বিশাল এজেন্সী এলেকা তাদের অনুকূলে, কোনো "কৃষকদের গ্রামে মুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সুযোগ নকশালপন্থীদের নাই। সম্প্রতি পুলিস অফিসাররা হিসাব করে ঠিক করেছেন, এই আন্দোলন এক বছরের মধ্যেই শেষ করে দেওয়া যাবে। মার্কসবাদী নেতা বাসবপুন্নাইয়া তাদের ছয়মাসের সময় দিয়েছেন, কারণ

"তারা বিচ্ছিন্নভাবে লড়াই করছে এবং ক্ষমতায় বাইরে লড়াই করছে।" নকশাল-পন্থীরা কিন্তু আরও বেশীদিন টিকে থাকতে পারে, চম্বল উপত্যকার ডাকাতদের মত, যদি তারা পাহাড় অঞ্চলে থাকে এবং গোপনে পাহাড়তলীর গ্রামগুলিতে এসে আক্রমণ চালায় ও জমিদারদের বাড়ী লুঠ করে।

ভারতীয় জনতা একটা বড় রকমের বিপ্লবে "জ্বলে উঠতে প্রস্তুত"—যদিও নকশালপন্থীদের এই তত্ত্বের অসারতা দুই কমিউনিষ্ট পার্টিই বুঝতে পেরেছে, তথাপি দুর্ভাগ্যের কথা, ইস্কুল ও কলেজের ছাত্ররা নকশালপন্থীদের সর্টকাট রাস্তার দিকেই "আকৃষ্ট হচ্ছে।"

'পরিস্থিতি' এমনই ঘোরালো হয়ে উঠেছে যে লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবনকে পর্যন্ত বিবৃতি দিয়ে শোষকশ্রেণীকে আশ্বস্ত করতে হচ্ছে। গত ২৮শে আগষ্ট চ্যবন যে বিবৃতি দেন, তা আমরা 'যুগান্তর' পত্রিকা থেকে তুলে দিচ্ছি—

নয়াদিল্লী, ২৮শে আগষ্ট (পি. টি. আই)—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চ্যবন আজ লোকসভায় চরমপন্থী কম্যুনিষ্টদের কার্যকলাপ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে বলেন, দেশের নানাস্থানে নকশালপন্থীদের দ্বারা যে সব হিংসাত্মক ঘটনা ঘটছে, সেগুলি 'উপেক্ষা করা বা মার্জনা করা' হচ্ছে না। তবে এই সঙ্গে 'আমাদের পক্ষে আতঙ্কগ্রস্ত বা ঘটনাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেখাও অনুচিত।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই অভাস দেন, পার্লামেণ্টের রাজনৈতিক দলগুলি খুব বেশি আগ্রহী না হলে, তিনি এর প্রতিবিধানকল্পে কোন আইন প্রণয়নে আগ্রহী হবেন না।

শ্রীচ্যবন এই প্রসঙ্গে সভাকে স্মরণ করিয়ে দেন, নকশালপন্থীদের ব্যাপার নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি সভার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে স্বতন্ত্র দল ও কয়েকজন নির্দল সদস্য ছাড়া আর কেউ সাড়া দেননি। কারণ, যেসব রাজনৈতিক দল সাড়া দেন নি, তাঁরা মনে করেছিলেন, এটা সংস্থা গঠনের স্বাধীনতায় মৌল অধিকারের পরিপন্থী বা এই অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ।

শ্রীশিবাপ্পা, শ্রীজগন্নাথ রাও রাও যোশী ও শ্রীপ্রেমচাঁদ ভার্মা···

প্রভৃতি সদস্যগণ পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কেরলে নকশাল-পন্থীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

শ্রীরণেন সেন (সি পি আই) বলেন, অন্ধ্রের শ্রীকাকুলাম জেলায় পুলিশ নকশালপন্থীদের শায়েস্তা করার নামে নিরস্ত্র লোকদের গুলি করে মেরে ফেলেছে। কম্যুনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী এই ঘটনার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

শ্রীচ্যবন বলেন, শ্রীকাকুলাম জেলা নকশালপন্থীদের 'পীঠস্থান'। অন্ধ্র সরকার দৃঢ় হাতে তার মোকাবিলা করছেন বলে তিনি আনন্দিত।

সভাকে এই আশ্বাস দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারগুলি নকশালপন্থীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারও খুব কড়া মনোভাব অবলম্বন করেছেন। এমনকি কেরলা সরকার যথেষ্ট উৎসাহ দেখাচ্ছেন বলে তিনি খুশি হয়েছেন।

শ্রীবাজপেয়ী বলেন, নকশালপন্থীদের রাইফেল ছোঁড়া শেখানো হচ্ছে। তা ছাড়া এদের কেন 'ট্রেণিং ক্যাম্প' খুলতে দেওয়া হয়, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। বাইরের কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে নকশালদের যোগসাজস আছে কিনা—তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তা জানতে চান।

শ্রীচ্যবন বলেন যে, দেশের উগ্রপন্থীরা চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতেই বেশি আগ্রহী। এই সমস্ত দল একটা সমন্বয় কমিটি গঠনের চেষ্টা করেন কিন্তু এ ব্যাপারে তা বেশিদূরে অগ্রসর হতে পারেন নি। গত এপ্রিলে মার্কসিষ্ট-লেনিনিষ্ট কম্যুনিষ্ট (সি. পি. আই-এম-এল) পার্টি নামে একটি দল গঠিত হয়। তারা যে উত্তর প্রদেশের কয়েকটি জেলায় তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তা তিনি জানেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন যে, একটি বৈদেশিক রাষ্ট্রই নকসালপন্থীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। মাও-এর আদর্শ ও চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতি তাঁরা আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকেন।

শ্রীচ্যবন আজ এ সম্পর্কে লোকসভায় একটি বিবৃতি দেন। এই বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গত ছ-মাসে বিভিন্ন রাজ্য থেকে যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া

গেছে তা থেকে জানা যায় সে অন্ধ্র প্রদেশে চরমপন্থীদের কার্যকলাপের ফলে ২৭ ব্যক্তি নিহত এবং প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি লুণ্ঠিত অথবা ধ্বংস হয়েছে। বিহারে চরমপন্থীরা দুটি ডাকাতি ও একটি দাঙ্গা হাঙ্গামার ঘটনার সঙ্গে জড়িত। এই সমস্ত ঘটনায় ৪ জন নিহত ও প্রায় দশ হাজার টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়েছে। পাঞ্জাবে চরমপন্থীদের আক্রমণে দু' ব্যক্তি আহত হয়। গত জুন মাসে হোসিয়ারপুর জেলার একটি ঘটনায় তিন ব্যক্তির মৃত্যু হয়। এ সম্পর্কে তদন্ত করা হচ্ছে।

কিন্তু এ তো গেল প্রতিক্রিয়াশীল পত্রিকার প্রলাপ। এই সমস্ত রিপোর্টে শোষক শ্রেণীর আতংক ফুটে উঠেছে। এবার আসা যাক বিপ্লবী জনতার মুখ-পত্রের প্রসঙ্গে। ভারতের সশস্ত্র সংগ্রাম যত এগিয়ে চলেছে ততই দেশের বিপ্লবী জনতা আশান্বিত হচ্ছেন। দেশের জনগণের সম্মুখে এই সংগ্রামের খবর পরিবেশন করছে যে সব পত্রিকা, তাদের মধ্যে 'দেশব্রতী' অন্যতম। নকশালবাড়ী আন্দোলনের অন্যতম নেতা শ্রদ্ধেয় কমরেড চারু মজুমদার শ্রীকাকুলাম থেকে ফিরে মার্চ মাসে 'দেশব্রতী'তে লেখেন, "**শ্রীকাকুলাম কী ভারতের ইয়েনান হতে চলেছে!**" এই প্রবন্ধের অংশবিশেষ এখানে তুলে দিচ্ছি—

"নকশালবাড়ির লড়াই শুরু হবার পর আজ দু'বছরও পার হয়নি, এরই মধ্যে তার স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এবং দাবানলের রূপ নিতে চলেছে অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীকাকুলামে।

চারদিকে পাহাড়ে ঘেরা, মাঝখানে জঙ্গল; এই পরিবেশে একটা টিলার উপর একটা ঘরে বসে আছি। সামনে বসে আছেন জনা কুড়ি যুবক। এদের কোনো নাম নাই, কোনো সর্ব ভারতীয় প্রতিষ্ঠা নাই। এঁরা তরুণ, এঁরা স্বপ্ন দেখছেন, ভারতবর্ষের কোটি কোটি কৃষক যারা যুগ যুগ ধরে শোষিত, অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হয়েছে তাদের তাঁরা মুক্তি আনবেন; মুক্তি আনবেন শোষণ থেকে, মুক্তি আনবেন অন্ধকার থেকে, দারিদ্র্য ও ক্ষুধা থেকে। তাঁরা বিপ্লবে বিশ্বাসী, সশস্ত্র কৃষকই যে বিপ্লব সফল করতে পারে এ বিশ্বাসে তাঁরা দৃঢ়। তাঁরা উপস্থিত হয়েছেন অন্ধ্রের শ্রীকাকুলাম জেলা থেকে; তাঁরা উপস্থিত হয়েছেন তেলেঙ্গানার ওয়ারেঙ্গল, নালগোণ্ডা ও আদিলাবাদ থেকে; তাঁরা উপস্থিত হয়েছেন রয়ালসীমার জেলাগুলি থেকে, অন্ধ্রের প্রায় অধিকাংশ জেলার

প্রতিনিধি তাঁরা। তাঁরা অলস স্বপ্ন দেখেন না ; সকলেই কৃষকের মধ্যে কাজ করেন, ঘরবাড়ি ছেড়েছেন, গোপনীয়তা রক্ষা করেন। তাঁদেরই চেষ্টায় গড়ে উঠেছে শ্রীকাকুলামের সংগ্রাম, যে শ্রীকাকুলাম সারা ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের

আমাদের শ্রদ্ধেয় ও প্রিয়
নেতা কমরেড চারু মজুমদার

মনে বিরাট ভরসা জাগিয়ে তুলেছে। শ্রীকাকুলামের কাহিনী এ বিশ্বাস দৃঢ় করেছে যে অদূর-ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে গড়ে উঠবে ইয়েনান। এরাই সৃষ্টি করেছেন উড়িষ্যার কোরাপুট জেলার কৃষক সংগ্রাম। আতঙ্কিত প্রতিক্রিয়াশীল সরকার দমননীতি চালিয়ে সে সংগ্রামকে স্তব্ধ করতে পারেনি, পারেনি নেতৃত্বকে স্পর্শ করতে।

...তাঁরা ঘোষণা করেছেন যে শ্রীকাকুলামে যা ঘটছে তা ঘটছে একমাত্র মাও সে-তুঙ-এর বিচারধারার উপর ভিত্তি করে। তাই অঞ্চের মানুষের কাছে, 'তুমি বিপ্লবী? কি, বিপ্লবী নও?' তার বিচারের একমাত্র মাপকাঠি শ্রীকাকুলাম। এ মাপকাঠি শুধু অঞ্চের মানুষের জন্যই নয়, আজ সারা ভারতের মানুষের কাছে শ্রীকাকুলাম একটি মানদণ্ড।

তাঁরা স্বপ্নবিলাসী নন, তাই সহজ জয়ের কথা চিন্তা করছেন না ; তাঁরা জানেন, আঘাত আসবে, এবং বড় রকমের ধাক্কাও তাঁরা খেতে পারেন ; সেই ধাক্কা খাওয়ার জন্য তাঁরা প্রস্তুতও হচ্ছেন, সে বিপদ সম্পর্কে তাঁরা খুব সচেতনই রয়েছেন।

...চেয়ারম্যানের শিক্ষা, "যেখানে সংগ্রাম সেখানেই আত্মত্যাগ, মৃত্যু সেখানে দৈনন্দিন ঘটনা।" তাই বিপ্লব সফল করতে হলে বিপ্লবী কর্মীকে ত্যাগ স্বীকার করতে শিখতে হবে, ত্যাগ করতে হবে সম্পত্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য, ত্যাগ করতে হবে পুরানো অভ্যাস এবং নামের আকাঙ্ক্ষা, ত্যাগ করতে হবে মৃত্যুভয় এবং সহজ পথে চলার চিন্তা ; তবেই আমরা বিপ্লবীদের শ্রমসাধ্য দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করতে পারব ; তবেই আমরা জনতাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারব মহত্তর ত্যাগে, যার আঘাতে সাম্রাজ্যবাদ, সংশোধনবাদ এবং ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ধ্বংস হবে এবং বিপ্লব সফল হবে।

...বিদায় নেবার সময় মনটা হঠাৎ খারাপ লাগল। এই কমরেডদের সঙ্গে আবার দেখা হবে কিনা কে জানে! শহীদের মন্ত্রে দীক্ষিত এই বিপ্লবী কমরেডরা লড়ায়ের ময়দানে গিয়ে নামবেন। কে বেঁচে থাকবেন, কে থাকবেন না জানি না ; কিন্তু এটা জানি যে এদের নাম ভারতবর্ষের মানুষ ভুলবে না।

হঠাৎ চোখের সামনে দেখলাম, অন্ধকার ভারতবর্ষ যেন দূর হয়ে গেল, উজ্জ্বল সূর্যালোকে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে আমার দেশ ভারতবর্ষ, জনগণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ, সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষ। শ্রীকাকুলাম লড়ছে, সারা অন্ধ্র কাল লড়বে, তারই প্রতিশ্রুতি পেলাম যেদিন ফিরে আসছি সেই দিনের সকালের খবরের কাগজে ; একজন শ্রেণীশত্রু কৃষক গেরিলাদের আক্রমণের শিকার হয়েছে। শ্রীকাকুলাম এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে।"

হ্যাঁ, সত্যিই, শ্রীকাকুলাম এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে ভারতের ইয়েনান হ'তে। শ্রীকাকুলামের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গণ ঘুরে এসে 'দেশব্রতী'র নিজস্ব প্রতিনিধি হায়দারাবাদ থেকে যে রিপোর্ট পাঠান, তা প্রকাশিত হয়েছে 'দেশব্রতী'র ১৪ই আগষ্ট, '৬৯-এর সংখ্যায়। আমরা এখানে তার প্রায় সবটাই উদ্ধৃত করছি—

'শ্রীকাকুলামে কী কমঃ চারুমজুমদারের ভবিষ্যৎবাণী সফল হতে চলেছে?'

হায়দারাবাদ, ৪ঠা আগষ্ট—তেলেঙ্গানার কথা মনে পড়ছিল। শ্রীকাকুলামের ধ্যান গম্ভীর পাহাড়শ্রেণীর দিকে যত এগিয়ে যাচ্ছিলাম ততই মনে পড়ছিল যে এই অন্ধ্রপ্রদেশেরই তেলেঙ্গানার কৃষক নারী-পুরুষ কী অসীম বীরত্বের সাথে পাঁচ

বছর ধরে লড়েছিলেন নিজাম আর ভারতীয় প্রতিক্রিশীয়ালদের বিরুদ্ধে ! কেবল কি তেলেঙ্গানায় ? কী দীর্ঘ ইতিহাস আমাদের দেশের বীর কৃষকদের সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের !

চেয়ারম্যানের লেখাটা মনে পড়েছিল—"একশ' বছর ধরে দুর্দশাগ্রস্ত চীন জাতির সবচেয়ে সেরা ছেলেমেয়েরা একজন পড়ে যাবার পর অন্যজন ফাটলে পা বাড়িয়ে দিয়ে লড়াই করে গেছেন,—জীবন বলি দিয়েছেন সেই সত্যের সন্ধানে যা দেশ এবং জনগণকে মুক্ত করতে পারে। এই ইতিহাস আমাদের কণ্ঠে গান এনে দেয়, চোখে আনে জল। একমাত্র প্রথম মহাযুদ্ধ ও রুশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের পর আমরা পেলাম সেই সব সত্যের সেরা সত্য ; আমাদের জাতিকে মুক্ত করার সবচেয়ে সেরা অস্ত্র মার্কসবাদ-লেনিননাদ ।.....চীনা বিপ্লবের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত হবার পর মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিরায়ত সত্য চীনা বিপ্লবকে এক নতুন রূপ দান করলো।"

অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে, তেলেঙ্গানা বিফল হয়েছে, সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়নি তখন। সেই সব সত্যের সেরা সত্য, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর মাও সেতুঙ চিন্তাধারার সন্ধান পেয়েছেন আজ কমরেডরা। ভারতবর্ষের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যুক্ত হয়ে ভারতের মুক্তিসংগ্রামকে সেই সত্য নতুন রূপ দিয়েছিল নকশালবাড়িতে তেলেঙ্গানার ব্যর্থতাকে পেরিয়ে, যার ঝাণ্ডা আজ সগৌরবে উড়ে চলেছে ভারতের পাঁচটি রাজ্যে।

শ্রীকাকুলামকে যখন দেখলাম, শ্রীকাকুলামের মর্মবস্তু পার্বতীপুরম, পাথপট্টনম্, পালকোণ্ডা এজেন্সির মহান যোদ্ধা জনগণের সাথে যখন ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল তখন আত্মপ্রত্যয়ের সাথে উপলব্ধি করলাম যে মাও সেতুঙ চিন্তাধারা সত্য সত্যই বর্তমান যুগের সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর (Proletarian) আদর্শের সর্বোচ্চ রূপ, আর তা সত্যিই বস্তুবাদী শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

আমাদের প্রিয় নেতা শ্রদ্ধেয় কমরেড চারু মজুমদার গত মার্চ মাসে শ্রীকাকুলাম থেকে ফিরে গিয়ে দেশব্রতীতে লিখেছিলেন "শ্রীকাকুলাম কি ভারতের ইয়েনান হতে চলেছে ?'

শ্রীকাকুলামে যাওয়ার আগে পর্যন্ত বুঝতে পারিনি যে কী অসাধারণ

গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন তিনি পাঁচ মাস আগেই, যখন শ্রীকাকুলামের লড়াই সবেমাত্র দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

তীব্রতম শ্রেণীসংগ্রামের ফলে বন্য জন্তুর মত হিংস্র শত্রু অন্ধ্রের কংগ্রেস সরকার। সারা অন্ধ্রের গ্রাম, শহর, রেল ষ্টেশন তার গুপ্তচরে ছেয়ে গেছে—সদর রাস্তায় বাস, লরি, এমনকি ট্যাক্সি থামিয়ে তারা খোঁজ নেয়; রাতের ট্রেনগুলির কামরায় কামরায় কুকুরের মত শুঁকে বেড়ায়। শত্রুর এমন সতর্কতার মধ্যেই কি সুন্দর ব্যবস্থা করে কমরেডরা নিয়ে গেলেন বিভিন্ন শহর, গ্রাম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। গোপনীয়তাটা এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে কৃষক পুরুষ, নারী, ছেলেমেয়েদের। কারও অহেতুক কৌতূহল নেই, পরিচয় জানবার কোন আগ্রহ নেই—পরমাত্মীয়ের মত খাওয়া থাকার ভার বয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে নিচ্ছেন পৌঁছবার সাথে সাথেই। এক জায়গায় যাওয়ার আগে লোক পাঠিয়ে সেখানকার অবস্থা জেনে নেওয়া হচ্ছে, সেখান থেকে কমরেডদের ডেকে পাঠিয়ে তার জিম্মায় অতিথিকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। বিপ্লবী গোপন সংগঠনের চমৎকার সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত, যার থেকে আমাদের শেখবার আছে।

চীনের মহান কমিউনিষ্ট পার্টির উর্ধ্বতন নেতা থেকে সুরু করে সাধারণ কমরেডটি পর্যন্ত এমন বিনয়ী যে দেখলে মনে হয় যেন ইস্কুলে পড়ে শেখা বিনয়। চীনের মহান কমিউনিষ্ট পার্টি বলেন, "এটা হচ্ছে পার্টির কাজের একটি পদ্ধতি। অন্ধ্রের কমরেডদের মধ্যে এই মহৎ গুণটি পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। তারা অসাধারণ বিনয়ী। কি দরদ কমরেডদের প্রতি! চা, সিগারেট, এমনকি ঐ পাহাড়ী এলাকায় পান খাওয়ারও যাতে অসুবিধে না হয় তার জন্য আগে থেকেই ব্যবস্থা। নানা প্রশ্ন অথচ এমন বিনয় নম্র, এমন আত্মসমালোচনাময়। গিরিজনদের অবিসম্বাদী নেতা কমরেড সত্যনারায়ণকে দেখলাম। ৫৭ বছর বয়েস, ছোট-খাট লোকটি। মাষ্টার হিসাবে এসেছিলেন ১৯৬০ সালে, এক আদিবাসী মহিলাকে বিয়ে করে এখানেই থেকে গেছেন। সবাই বলে মাষ্টার, কিন্তু কাছে গিয়ে ডাকবার বা কথা বলবার সময় বলে গুরু! গিরিজনরা বলে, "গপ্পা গুরু" অর্থাৎ বড় গুরু। অনেক গল্প ছড়িয়ে গেছে কমরেড সত্যনারায়ণের নামে। ছড়িয়েছে শ্রেণীশত্রুর কেউ কেউ, আর বেশী করে পুলিসরা। সত্যনারায়ণ নাকি ঘোড়ায় চড়ে গেরিলাদের নেতৃত্ব করে বেড়ান, তাঁর হাতে সব নাকি মারাত্মক চীনে অস্ত্রশস্ত্র আছে যাতে পুলিশ তাঁর

কাছে ঘেঁষতে পারে না। ইদানিং আবার চালু হয়েছে যে কমরেড সত্যনারায়ণের নাকি একটি ছোট এরোপ্লেন আছে তাতে চড়ে একাধারে শ্রীকাকুলামে লড়াই চালাচ্ছেন আর তেলেঙ্গানায় গিয়ে লড়াই লাগিয়ে দিয়ে আসছেন।

...প্রথম শ্রেণীর নেতারা ও গিরিজন কমরেডরা ছাড়াও আছেন বি, এসসি পাশ প্রাক্তন ছাত্র, আছেন শিক্ষক, শিক্ষিকা, শহরের শ্রমিক, আছেন ডাক্তার ও তাঁর স্ত্রী। কেউ সংগঠক কেউ গেরিলা কমাণ্ডার, কেউ কেউ কেন্দ্রীয় হাসপাতালের চিকিৎসক। প্রত্যেকে অ্যাকশানে অংশ নিয়েছেন, শ্রেণীশত্রুর রক্তে হাত রাঙিয়েছেন। কিন্তু কারো কোন অহঙ্কার নেই।

চেয়ারম্যান বারে বারে বলেন—"জনগণকে চেন, জনগণকে বোঝ, জনগণকে গুরু মানো। কারণ, তুমি নও, জনগণই প্রকৃত বীর, জনগণই বিশ্ব-ইতিহাসের নিয়ামক শক্তি।" এখানকার জনগণকে না দেখলে, না বুঝলে শ্রীকাকুলামের মর্মবস্তুকে বোঝা যাবে না, অসাধ্য সাধনের মূল-মন্ত্রটি ধরা যাবে না। তাই বলছিলাম কমরেড চারু মজুমদারের লেখাটি যে কি অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী তা বুঝতে পারিনি এজেন্সি এলাকার সংগ্রামী নেতা ও জনগণকে দেখার আগে পর্যন্ত।

ছোট বড় নানা মাপের পাহাড়ের পর পাহাড়—যতদূর চোখ যায় কেবল পাহাড়। ঘন ঘন জঙ্গলে ভরা, ঝোপে, ঝাড়ে ঠাসা পাহাড়ী পথে চলতে চলতে হয়রাণ হয়ে যাবার পর পাওয়া যাবে একটি গ্রাম। কোন সময় কেবল একটি মাত্র ঘর নিয়ে এক গ্রাম, কোন সময়ে তিন, চারটি, বেশীর মধ্যে দশ-বারোটি—এই এলাকার গ্রাম। একেবারে সরলতম জীবনযাত্রা। চালের ভাত খাওয়া আজও প্রচলিত হয়নি, প্রধান খাদ্য আমের আঁটির ভেতরের শাঁস শুকিয়ে গুড়ো করে লেই বানিয়ে খাওয়া যা হজম করার শক্তি বাইরের খুব কম লোকেরই আছে।

এরাই আজ জেগে উঠেছেন, রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। লেখাপড়ার তো প্রশ্নই ওঠেনা, তথাকথিত সভ্যতার ছিটেফোঁটাও ঢোকেনি, নীচু চাল, দিনের বেলাতেও অন্ধকার—ঘরগুলির মধ্যে। সেই মানুষগুলি আজ ভারতবর্ষের সব চেয়ে রাজনীতি-সচেতন মানুষগুলির অন্যতম, অন্ধকারময় পশ্চাদ্‌পদ পাহাড়ী গ্রামগুলিকেই তাঁরা আজ ভারতবর্ষের সবচেয়ে উজ্জ্বল সবচেয়ে অগ্রসর বিপ্লবের ঘাটি করে গড়ে তুলেছেন। তার প্রমাণ পেয়েছি পদে পদে, প্রমাণ

পেয়েছি খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যে, প্রমাণ পেয়েছি গেরিলা কার্যকলাপগুলির বিবরণের মধ্যে দিয়ে। পুলিশ পুরো গ্রামটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে—চারদিকে ধোঁয়া আর কাঠ, ঘর পোড়া গন্ধে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। গেরিলা দল এলেন—জনগণ কোন ক্ষোভ জানালেন না, ঘর দুয়োর জ্বলে গেছে বলে অভিযোগ করলেন না। গেরিলাদের দেখে উৎফুল্ল হয়ে বল্লেন—"কমরেড! শালারা খাবার জিনিস সব পুড়িয়ে দিয়ে গেল যে, তোমাদের তো পুরো পেট খেতে দিতে পারবো না! যা আছে, এসো, তাই ভাগ করে খাই।" আটশ'-এরও উপর গিরিজন জেলে বন্দী, তাঁদের পরিবারের লোকজনের কেউ গেরিলা, কেউ গ্রামরক্ষী, কেউ গেরিলাদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থায় ব্যস্ত। কোন নিরাশা নেই, ভীতি নেই। মাঝে মাঝে কেউ কেউ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আসছেন। জেলে যাওয়ার আগে তেমন কিছু করতেন না, (কাজের লোকদের পুলিস কমই ধরতে পারে) জেল থেকে এসেই কাজ করতে চাচ্ছেন—লড়াই করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। একটার পর একটা অ্যাকশন করে চলেছেন গেরিলা দলগুলি। প্রথমে পাহাড়ী এলাকা থেকে জমিদার ও দালালদের খতম করেছেন। তখন কংগ্রেস, সংশোধনবাদী ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলরা প্রচার করছিল এ কেবল পাহাড়ী এলাকার লোকদের ব্যাপার, সমতলে এর কোন প্রভাব পড়বে না। তারপর অ্যাকশান হয়ে চলেছে সমতলভূমিতে। শ্রেণীশত্রু জমিদার খতম হচ্ছে একের পর এক। পুলিশের নিয়মিত পাহারাও তাদের বাঁচাতে পারছে না। শ্রেণীশত্রুকে হত্যা করে তার সমস্ত সম্পত্তি মায় ঝাঁটাগাছটা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করে বিলি করে দেওয়া হচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে। যে সমস্ত জিনিসপত্র গেরিলা দল নিয়ে আসছেন তা সব জমা হচ্ছে পাটি কেন্দ্রে। অংশগ্রহণকারী অসম সাহসী গিরিজন বা অন্য কৃষক কমরেডদের সম্বন্ধে কখনই শোনা যায়নি যে ব্যক্তিগতভাবে কেউ কখনও কোন জিনিসের প্রতি লোভ দেখিয়েছেন!

...কথায় কথায় চেয়ারম্যান মাও-এর নাম করতে শুনেছি নিরক্ষর সাদাসিদে গিরিজন কমরেডদের। একজন গিরিজন স্কোয়াড কামাণ্ডার এলেন দুটি পুলিস মারার খবর নিয়ে। সঙ্গী কমরেড জিজ্ঞাসা করলেন—"পুলিস মারলে কেন?" জবাব এল—"বাঃ মারবো না! চেয়ারম্যানমাও যে বলেছেন পুলিস দেখলেই মারবে!"

চেয়ারম্যানকে দেখার কি গভীর আগ্রহ! অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছেন "চেয়ারম্যানকে আমরা দেখতে পাবো না?" এতো সাধারণ রাজনৈতিক চেতনা নয়! এ তো উচ্চমাত্রার আন্তর্জাতিকতাবোধ। পশ্চাৎপদ, অশিক্ষিত, সরল আদিবাসীদের পক্ষে কি করে সম্ভব হল এই উচ্চমাত্রার রাজনীতি-সচেতনতা? ধাপে ধাপে গণসংগঠন করে অর্থনৈতিক আন্দোলনে একটার পর একটা অংশ গ্রহণ করে তো তাঁরা আসেন নি? তাহলে? কোন "দুর্দ্ধর্ষ তাত্ত্বিক"-এর কাছে হাতজোড় করে বসে ক্লাসও তো শোনেন নি? তাহলে? চেয়ারম্যান বলেছেন—"উৎপাদনের জন্য সংগ্রাম, শ্রেণীসংগ্রাম ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সঠিক চিন্তাধারা জন্মগ্রহণ করে।" আর বলেছেন, "আগে শেখা, পরে করা নয়, করাটাই শেখা।" এই মহান সত্যের প্রমাণ শহরের তাত্ত্বিক তর্কের মধ্যে মিলবে না—আমি বলবো, প্রমাণ যদি চান, সমাধান যদি চান তো শ্রীকাকুলামের সংগ্রামী জনগণকে দেখে আসুন! আর বুঝে আসুন যে গেরিলা পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে শ্রেণীসংগ্রামের সর্বোচ্চ রূপকে গ্রহণ করে মাও সেতুঙ চিন্তাধারার রাজনীতি প্রচারে অংশ গ্রহণ করলেই এই সচেতনতা আসে।

সাড়ে তিন দিন ধরে হেঁটেই চলেছি। এক এক গ্রামে বিশ্রাম করি, তারপর হাঁটি। কমরেডরা বলেন, আমরা 'সেন্টার'-এর সাথে দেখা করতে চলেছি। 'সেন্টার' বললে সকলেই বুঝতে পারে কেন্দ্রীয় স্কোয়াড। এক গ্রাম থেকে ভোরে রওনা দিলাম, আজ নাকি সেন্টারের সাথে দেখা হবে। পাহাড়ের চড়াই উৎরাই হাঁটতে হাঁটতে হয়রান হয়ে গেছি—সকলেই হয়রান—চলতে চলতে মাঝে মাঝে বড় পাথর দেখে বসতে হচ্ছে বিশ্রামের জন্য। দূরে সমতল দেখা যায় আর দেখা যায় রুপোলী ফিতের মত উড়িষ্যা সীমান্তের নদী, তারপরই উড়িষ্যার সুউচ্চ পাহাড় শ্রেণী। ভেবে চলেছি সেন্টারের সাথে প্রথম সাক্ষাৎটা কেমন হবে? কমরেডরা বিরক্ত হবেন নাতো, হয়তো আগের রাতেই কোন অ্যাকশন করে এসেছেন, সকলেই হয়তো ক্লান্ত। আবার হাঁটা, খালি পা পাথরের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, খুঁড়িয়ে হাঁটছি আর আকুল আগ্রহে আশা করছি এই পাহাড়টা পেরুলেই বোধ হয় সেন্টারে পৌঁছব। একটা পাহাড় পেরিয়ে সটান ঢালুর দিকে নামছি। সূর্য্য উঠতে সুরু করেছে পূর্ব—দিগন্ত রক্ত রঙে লাল হয়ে গেছে। পাহাড়ের ঘন নীলের ফাঁকে ফাঁকে রাঙা আকাশের রঙ আরো

যেন খুলে গেছে। ঢালু বলে প্রায় ছুটে নামতে হচ্ছে—হঠাৎ কানে এলো সমবেত কণ্ঠে গান—যত কাছে যাচ্ছি গানের ভাষা স্পষ্ট হচ্ছে--"অরুণ পতাকা মা"—কাছাকাছি এসে প্রথমেই দেখতে পেলাম সগৌরবে পত্‌পত্‌ করে ওড়া লাল ঝাণ্ডাটি। সসংকোচে আমরা কয়েকজন গিয়ে উপস্থিত হলাম। দুদিকে দুসারি ঘরের মাঝখানের খোলা জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে রক্ত পতাকার জয়ধ্বনি গাইছেন সেণ্টারের কমরেডরা। একজন কমরেড মাঝখানে ঝাণ্ডাটা উঁচু করে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আর হাত মুঠো লাল সেলাম দিয়ে সমবেত কণ্ঠে সকলে গান গাইছেন। প্রথম কলি গাইছেন কমরেড সত্যনারায়ণ ও দুজন মহিলা, পরে সকলে মিলে গাইছেন। বেশীর ভাগেরই গলায় সুর নেই। অনেক গিরিজন কমরেড দেখলাম গানের পুরো ভাষাটাও জানেন না কিন্তু নিজের ঝাণ্ডার প্রতি মমতা, সংকল্পের প্রতি দৃঢ়তা প্রকাশে এতটুকুও অসুবিধে দেখলাম না। সূর্য্যের প্রথম আলো সকলের চোখে মুখে, দীপ্ত কণ্ঠের গানে চারি দিকের পাহাড় মুখরিত। গানটির রচয়িতা ও সুরকার অন্ধ্রের বিখ্যাত বিপ্লবী শিল্পী কমরেড সুব্বারাও পাণিগ্রাহী। কমরেড পাণিগ্রাহীকে সিনেমা থেকে ডেকেছে। তাঁর নাটক করে হাজার হাজার টাকা উঠেছে—অনুষ্ঠানকারীরা কমরেড পাণিগ্রাহীকে প্রচুর টাকা দিতে চেয়েছে—কিন্তু কমরেড পাণিগ্রাহী সব কিছুকে প্রত্যাখ্যান করে বিপ্লবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁর ওপর আক্রোশে তাঁর ভাই ও বোনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গান শেষ হলে পাহাড় কাঁপিয়ে শ্লোগান উঠলো, "চেয়ারম্যান মাও জিন্দাবাদ", 'কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেনিনবাদী) জিন্দাবাদ," "বিপ্লব জিন্দাবাদ", "প্রজাসৈন্যম (গণফৌজ) জিন্দাবাদ"। তারপর সারাদিনের কাজের প্রোগ্রাম। দিন পাহারার, রাত পাহারার কমাণ্ডার, রান্নাবান্নার ভার, রুগীর পথ্যি, রাজনৈতিক আলোচনা—সব কিছুর দায়িত্ব বিভাগ এই ভাবে রোজ সকালে লাল ঝাণ্ডাকে লাল সেলাম জানিয়ে নেওয়া হয়ে থাকে। যে কোন কাজই থাকুক, যত বড় অ্যাকশানই হোক, এর অন্যথা হবে না।

আমাদের দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন কমরেডরা। চারিদিকে "নমস্কারম্" শুনতে লাগলাম, কেউ কেউ এসে জড়িয়ে ধরলেন—আমার সমস্ত

আশঙ্কা মুছে গেল, কতকালের পরিচিতদের মধ্যে এসে পড়লাম বলে মনে হ'ল।

এক এক করে শুনতে লাগলাম এক একজনের পরিচয়--নতুন ভারত গড়ার কারিগরদের পরিচয়। মহান শহীদ কমরেড রেন্‌জিম-এর কথা শুনলাম। রেনজিমেরই গ্রামের আরেক কমরেডের সাথে পরিচয় হল। এক গেরিলা স্কোয়াডের কমাণ্ডার।

....অবাক হয়ে থাকলাম এই কমিউনিষ্ট মানুষের দিকে তাকিয়ে—তাঁর ভেতর দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম, কমরেড রেন্‌জিম, কমরেড বাবুলাল বিশ্বকর্মকারদের—যাঁদের কাছে নামের কোন মোহ নেই, নেতৃত্বের লোভ নেই, নিজের জীবনের প্রতি "আপন প্রাণ বাঁচা" ধরনের বুর্জোয়াসুলভ মমতা নেই—"এরাই তো প্রকৃত বীর।"

...এর মধ্যে একদিন সমস্ত এজেন্সি এলাকার সংগঠক, গেরিলা কমাণ্ডার ও গেরিলাদের এক মিটিং হয়ে গেল। রিপোর্ট করে চলেছেন কমরেডরা। গুরুতর এক সমস্যায় পড়েছেন এক গেরিলা কমাণ্ডার। কি সমস্যা? না, গ্রাম রক্ষীদেলকে যা বলা হয়েছে তা তারা মানছে না। কিরকম? তাদের পুলিশের সাথে লড়তে বলা হয় নি—কিন্তু তারা বলছে, গ্রাম রক্ষা মানে তো পুলিশের হাত থেকেও রক্ষা। তাই তারা পুলিশের সাথেও লড়ছে, পুলিশকে হয়রাণ করে অস্থির করে দিচ্ছে।

অ্যাকশনের অভিজ্ঞতা বললেন একজন গিরিজন গেরিলা কমাণ্ডার। "দুদিক থেকে আমরা ঢুকেছি জমিদারের বাড়িতে। জমিদার খাটের তলায় লুকিয়েছে। বল্লাম, বেরিয়ে এসো, না হলে ওখানেই তোমার মৃত্যু হবে। সে বেরিয়ে এসে কোথায় কি আছে সব দেখিয়ে দিল, তারপর তাকে কেটে ফেল্লাম।"

শ্রেণীঘৃণা দিন দিন বেড়ে নতুন স্তরে উঠেছে। কুখ্যাত জমিদার, খচ্চর দালাল, বজ্জাত ভদ্রবাবুদের খবর এনে দিচ্ছেন সমতলের গরীব কৃষকরা। এমন সুন্দর খুঁটিনাটি খবর আনছেন যে এক জমিদারের বাড়ীর বাইরের এক চালাঘরে সশস্ত্র গুণ্ডা বাহিনী রেখেও সে রেহাই পায়নি। গেরিলা দল একই সঙ্গে গুণ্ডা বাহিনী ও জমিদারের উপর চড়াও হয়ে উভয়কেই নিকেশ করে দিয়েছেন। যেখানে অ্যাকশান হবে সেই গ্রামের গরীব কৃষকই রাস্তা দেখিয়ে গেরিলাকে নিয়ে

যাচ্ছেন—পরে আশেপাশের গ্রামে খবর ছড়ালে তাঁরা অভিযোগ করছেন, "আমাদের ডাকলে না কেন?" জমিদার, সামন্তপ্রভুশ্রেণী আতঙ্কে মরে যাচ্ছে। তারা পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছে যে পুলিশ নাকি কমিউনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ছোট ছোট জমিদাররা মিটিং করে দরখাস্ত করছে যা দরকার নিয়ে যাও, কেবল প্রাণটি বাঁচিয়ে দাও, বাবা! জমিদারের রক্তে দেওয়ালে শ্লোগান লেখা হচ্ছে, জমিদারের কাটা মাথা প্রকাশ্যে টাঙিয়ে দিয়ে শ্রেণীক্রোধের প্রকাশ করছেন বিদ্রোহী কৃষকগণ। শ্রেণীক্রোধের এক ঘটনা বললেন একজন সবর-গিরিজন গেরিলা কমাণ্ডার! "আমাদের এলাকায় এক কুখ্যাত দালাল ও তার সঙ্গী সাধারণ ব্যবসায়ীকে ধরে ফেললাম। কমরেডরা দুজনকেই মেরে ফেলছিল—আমি বললাম, না! পার্টির তো সে সিদ্ধান্ত নয়। কেবল দালালটাকেই মারবে, অন্যজন গরীব ব্যবসায়ী, ভুল করে এসেছে। ওকে বিচার করে ছেড়ে দিতে হবে।" গণআদালত বসে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বিচারে দালালের প্রাণদণ্ডের আদেশ হল, ব্যবসায়ীটিকে রাজনীতি বুঝিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। কমাণ্ডার বললেন—আমি মাথায় এক বাড়ী দিয়ে দালালটাকে খতম করে দিলাম। কিন্তু তাতে তার রেহাই নেই। কৃষকেরা তাকে তিন টুকরো করে ফেললেন। তাতেও সোয়াস্তি না পেয়ে একজন তার পেটে ছোরাটা ঢুকিয়ে দিলেন—তবে নিশ্চিন্তি!"

দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ছে এই ক্রোধ। দূর দূরান্ত থেকে ডাক আসছে অ্যাকশানের জন্য। যেখানে অ্যাকশান হচ্ছে, পরে সেখানে পুলিস হামলা হচ্ছে, প্রচুর কৃষক গ্রেপ্তার হচ্ছেন। কিন্তু কোন সময়েই জিনিসপত্র বা ফসল পুলিস ধরতে পারছে না। প্রথম প্রথম গ্রেপ্তার যত ব্যাপক হত, এখন তেমন হচ্ছে না। যাঁরা ধরা পড়ছেন তাঁদের অনেক সময়ে ক্যাম্প থেকেই মারধোর করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। কারণ শত্রু বুঝতে পারছে যে সাধারণ কৃষককে ধরে অ্যাকশান বন্ধ করা যাবে না।

গেরিলা-অ্যাকশানকে আজ সংগ্রামের প্রধান ধরন হিসাবে সারা অন্ধ্রের কৃষক জনগণ গ্রহণ করেছেন। হরেকেষ্ট, জ্যোতি বসুদের পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসকে সব-সময়-চিবিয়ে-খাওয়া সি পি এম আজ অন্ধ্রের কংগ্রেস সরকারের কাছে পলিটব্যুরোর প্রস্তাবে হাত জোড় করে বলছে—"গিরিজনদের জমি দিয়ে দাও, কৃষকদের যতটা পারো সুবিধে দাও, না হলে উগ্রপন্থীদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।" তাদের গরম বুলি এখানে অচল।

...পাঁচ বছর আগে, চীনা বিপ্লবের বিপুল অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সহ-সভাপতি লিন পিয়াও সারা দুনিয়ার কমিউনিষ্টদের জন্য সূত্রীকরণ (generalise) করেছিলেন যে, "শত্রুর বিরুদ্ধে সমগ্র শক্তিকে সমাবেশ ও প্রয়োগ করার একমাত্র পথ গেরিলা যুদ্ধ। গেরিলা যুদ্ধই মৌলিক···কিন্তু অনুকূল অবস্থার চলমান যুদ্ধের সুযোগকে কোন ক্রমেই ছাড়া চলবে না।" মহান নবম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের পর কমরেড লিন পিয়াও-এর এই তত্ত্ব মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ক্ষেত্রে এক নূতন পর্যায় খুলে দিয়েছে। আমাদের দেশের পক্ষে আজ এ ছাড়া জনগণকে সমবেত করার অন্য কোন পদ্ধতিই নেই, অন্য কোন পদ্ধতি দিয়েই গেরিলা পদ্ধতির স্থান পূরণ করা যায় না। তার পরিপূর্ণ প্রমাণ অন্ধ্রের মাটিতে হয়ে গিয়েছে। সোজা এবং উল্টো অর্থাৎ ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক থেকেই তা আজ সেখানে প্রমাণিত সারা অন্ধ্র রাজ্যের কুড়িটি জেলার মধ্যে সাতটিতে গেরিলা লড়াই ছড়িয়ে গিয়ে অন্য সমস্ত দালাল পার্টির হাত থেকে জনগণকে টেনে এনেছে, আরও ৫-টিতে যে কোনো মুহূর্তে সুরু হবার অবস্থা, অন্য দিকে সারা দেশের সমস্ত শোষক শ্রেণী, মুৎসুদ্দি, পুঁজিবাদ ও তার বিভিন্ন রকমের দালালরা আমাদের পার্টি-গঠন ঘোষণার সাথে গেরিলা পদ্ধতিকেই প্রধান পদ্ধতি বলে নেওয়ার সাথে সাথে আতঙ্কিত হয়ে গেছে। তাদের প্রচ্ছন্ন দালালরা আর প্রচ্ছন্ন থাকতে পারলো না। সরবে চেঁচিয়ে উঠেছে—"সর্বনাশ হল। জনগণকে না জাগিয়ে (?) এভাবে সর্বনাশ হবে।" দাবীর লড়াই, গণ-সংগঠন বলতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে তারা এমন কাছা-খোলা হয়ে গিয়েছে যে "ভারতীয় বিপ্লবের স্তর", ভারতের শাসক ও শোষকশ্রেণীর চরিত্র সম্বন্ধে সব কিছু ঘুলিয়ে ফেলে নিজেদের যুক্তির স্বপক্ষে এমন তথ্য দিয়ে চলেছে যাতে আইনানুগ মোহ হয়, ভারত আর আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক থাকে না, পার্লামেন্টারী পথ বর্জন না করলেও চলে এবং শেষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরের আওয়াজে গিয়ে পড়তে হয়।

শ্রীকাকুলামের লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা এই পাহাড়ী এলাকার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে লালে লাল করে দিয়েছে সারা জেলা, সমগ্র অন্ধ্র। যত ক্ষমতা সুসংহত হচ্ছে, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ততই নতুন চেতনা আসছে। অ্যাকশান সুরু হবার পর পার্টি থেকে আওয়াজ দেওয়া হয়েছিল, এবারে গণসংগঠন গড়।

রায়তাঙ্গা সংগ্রাম সমিতি গড়ে উঠেছে সেই আওয়াজের ফলে ; এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এখন বুঝা যাচ্ছে, মহান সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব জনগণকে সংঘবদ্ধ করার ক্ষেত্রে পুরানো ধ্যানধারণার গণসংগঠনের জায়গায় যে নতুন ধারণা তুলে ধরলো, বিশ্ববিপ্লব তথা ভারতীয় বিপ্লবের ক্ষেত্রে তার তাৎপর্য কত গভীর। নবম কংগ্রেসের পর বোঝা যাচ্ছে যে বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ জনগণের উদ্যোগ চিরাচরিত গণসংগঠনের বেড়া পাকে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, তা সে সংগঠন যত বিপ্লবী পদ্ধতিতেই গড়ে উঠুক। চীনের মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শিক্ষা, সমগ্র জনগণের সাথে আলোচনা করে বিপ্লবী কমিটি কর—এবং একমাত্র এই কমিটি মারফতই সমগ্র জনগণের ইচ্ছা প্রকাশিত হতে পারে—শ্রীকাকুলামে এই নির্দেশের সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে—গণসংগঠন সম্বন্ধে আমাদের ধ্যানধারণাকে যে আমূল পাল্টাতে হবে এটিও ভারতের বিপ্লবী পরিস্থিতে মাও সেতুঙ চিন্তাধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক নতুন অভিজ্ঞতালব্ধ অতি মূল্যবান শিক্ষা—পার্টি, গেরিলাযুদ্ধ ; বিপ্লবী কমিটি !

পার্টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। অন্ধ্রের এই বিরাট কর্মকাণ্ডে পার্টি নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত। পার্টির বেআইনী কাগজ বেরুচ্ছে, লক্ষ লক্ষ পুস্তিকা ছাপা হচ্ছে।

...পাহাড়ী এলাকাটাকে যত দেখছি ততই মনে হচ্ছে কি চমৎকার আদর্শ জায়গা আধার এলাকা করার। চেয়ারম্যান নির্দে'শিত পাঁচটি গুণের সব কটিই যে রয়েছে এখানে! কে আমাদের ঠেকায়! শত্রু ওদের আক্রমণের ক্ষমতা বাড়াতে চেষ্টা করছে। কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সহ এনে বসাতে শুরু করেছে ক্যাম্প করে করে। সহ-সভাপতি লিন পিয়াও বলেছেন—"তোমরা লড়ো তোমাদের কায়দায়, আমরা লড়ি আমাদের কায়দায়। তোমরা নির্ভর করো আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সাজসরঞ্জামের উপর আর আমরা নির্ভর করি উচ্চ মাত্রার রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন জনগণের উপর।" ভালই হচ্ছে। ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি আমাদের সরবরাহ মন্ত্রীর বিনা মাইনের চাকরীটা না নিয়ে ছাড়ছে না।

বিদায়ের পালা এসে গেল। সমবেতভাবে বিদায় দিলেন সকলে—সমস্বরে বল্লেন "আবার এসো।" সমবেত কণ্ঠে শ্লোগান দিলাম সবাই।

আবার চড়াই উৎরাই। অন্ধকার হয়ে আসছে, পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে আন্দাজে হাঁটতে হচ্ছে। অন্ধকারে পাহাড়কে আরও গুরু গম্ভীর মনে হচ্ছে. নিস্তব্ধ, ধ্যানমগ্ন। দূরে দূরে, জোনাকীর আলোর মত গ্রামের ছুটো চারটে আলো দেখা যাচ্ছে।

ভাবতে ভাবতে আসছিলাম। এই কটা দিনেই কত দেখলাম, কত শিখলাম। ভাবছিলাম ধনী, জমিদার, সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ দালালদের বোঝা যায় যখন তারা আমাদের গালাগাল দেয়, কিন্তু তথাকথিত বিপ্লবী নামাবলীধারীরা শ্রীকাকুলামের গেরিলাদের যখন বলে "ডাকাত" তখন সহ্য করা যায় না। মৃত্যুকে যারা জয় করেছে, লোভ মোহকে যারা তুচ্ছ করেছে, নতুন ভারতের শক্ত বুনিয়াদের প্রতিটি ই ট গড়ে উঠছে যাদের রক্ত, অস্থি, মজ্জা দিয়ে, তাদের "ডাকাত" বলছো, তোমরা কারা, কি তোমাদের পরিচয়, কি তোমাদের অধিকার ?

রাতারাতি অন্ধকার পাহাড় থেকে নেমে এক জায়গায় জঙ্গলের মধ্যে বিশ্রাম করছিলাম, পথ শ্রমের ক্লান্তিতে সকলেই অবসন্ন। ভোরের আলো ফুটছিল জঙ্গলের গাছের ফাঁক দিয়ে। উজ্জ্বল চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে কমরেড বলছিলেন—"বিপ্লব রাজ্যের সীমারেখা মুছে দিয়েছে—এগিয়ে যাচ্ছি আমরা উড়িষ্যা, উড়িষ্যা পেরিয়ে মধ্য প্রদেশের দিকে।" বলতে বলতে সূর্য উঠতে লাগলো, আবার পূব দিগন্তে লাল হয়ে উঠলো। নিস্তব্ধ পাহাড়ের মধ্যে থেকে যেন সমবেত দৃপ্ত কণ্ঠের গান শুনতে পেলাম—সত্যনারায়ণের লেখা তেলেগু সঙ্গীত—

"কণ্ড বিগুভু তেলেগিনি ট্টি
কণ্ড জাতি বিরুড়া,
উপ্পেনাওয়ালে ওয়াক্কাসারি
লেচি মুন্দু কোরাকারা ॥"
[উঠে দাঁড়াও হে বীর আদিবাসী,
জাগিয়ে তোল তোমার
পেশীবহুল শরীর,
ঝড়ের বেগে ঝাঁপিয়ে পড়
শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে।"]

নকশালবাড়ীর লাল আগুন আজ সারা ভারতে দাবানল হয়ে জ্বলছে। শ্রীকাকুলাম থেকে ছড়িয়ে পড়েছে ওয়ারাঙ্গাল, খাম্মান, পশ্চিম গোদাবরী, গুন্টুর কৃষ্ণা, হোসিয়ারপুর, পাতিয়ালা, সাংগুল, ভাতিন্দা, লখিমপুর-খেরী, বস্তার, মুশাহারি, চম্পারণ, কোরাপুট, ওয়াইনাদ, পুলপল্লী, নাগা-মিজো-কুকী অঞ্চল, কোহিমা. দিনাজপুর, নামখানা, গোপীবল্লভপুর।

আসুন আমরা সোচ্চার করে ঘোষণা করি—

"আপন মতামত ও লক্ষ্য গোপন রাখতে কমিউনিষ্টরা ঘৃণা বোধ করে। তারা খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করে যে একমাত্র **বলপ্রয়োগের** দ্বারাই সমস্ত রকমের প্রচলিত সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ করে তাদের লক্ষ্য সিদ্ধ হতে পারে। **কমিউনিষ্ট বিপ্লবের** আতঙ্কে শাসক শ্রেণীরা কাঁপুক। শৃঙ্খল ছাড়া সর্বহারার হারাবার আর কিছুই নেই। জয় করবার জন্য আছে সারা জগৎ।

দুনিয়ার মজদুর এক হও!"

ইডেন হিন্দু হোষ্টেলের আবাসিকদের পক্ষ থেকে

শোষকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী পত্রপত্রিকায় ইডেন হিন্দু হোষ্টেলে আবাসিকদের উপর নয়া সংশোধনবাদী ঝটিকা বাহিনীর অকথ্য অত্যাচারের কথা চেপে যাওয়া হল, অথচ ছাত্রদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে, নোংরা ভাবে চিত্রিত করা হলো।

অবৈধ ছাত্র ইউনিয়ণকে (বি, পি, এস, এফ—ডান) বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য্য টাকা দেন—কিভাবে, এই প্রশ্নের জবাব চাওয়ার অপরাধে ছাত্ররা হয়ে যায় 'উচ্ছৃঙ্খল'। আর এই উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রদের দমনে আসে পুলিশ নয়—সাম্রাজ্যবাদী ঝটিকাবাহিনী। তারা নাকি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য্য ম্যাকনামারার ডিনার সঙ্গী সত্যেন সেনকে 'ঘেরাও মুক্ত' করতে এসেছে। জানি না একই রাষ্ট্র কাঠামোয় শোষকরূপ বাঘ, রামছাগল বনে গিয়ে সবরমতীর ঘাস চিবোয় কিনা। তবুও দেখলাম সত্যেন সেন—ঝটিকা বাহিনীর 'শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি' হয়ে গেলেন। কিন্তু বোমা, লোহার রড, সোডার বোতল, তলোয়ার হাতে নেওয়া প্রতিবিপ্লবী বীরেরা বিপ্লবী ছাত্রদের প্রতিরোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু আসবাব পত্র ভেঙে দিয়ে পালিয়ে গেল। সত্যেনবাবুকে আর পাওয়া গেল না। অতঃপর বিপ্লবী ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর পরিত্যাগ করে চলে যান এবং অবস্থা শান্ত হয়।

এবং প্রায় ১ঘণ্টা পরে ঝটিকা বাহিনী হিন্দুহোষ্টেলের দরজা ভেঙে সুপারকে ধাক্কা দিয়ে এবং সহকারী সুপারের মাথা ফাটিয়ে প্রবেশ করল। ব্যাপক লুঠ তরাজ আরম্ভ করল। সবশুদ্ধ সাতাশটি ঘড়ি, বেশ কিছু টাকা লুঠ হলো। গুণ্ডাদের অনেকের মুখ থেকে দেশীমদের গন্ধের সঙ্গে বেরিয়ে আসছিল আমাদের প্রিয় ছাত্রনেতা, যারা আজ গ্রামে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকদের সাথে একাত্ম হয়ে লড়াই করে চলেছে তাদের উদ্দেশ্যে গালাগাল। গুণ্ডারা 'মার্কসবাদী' তাই মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিন-স্তালিন-মাও সেতুঙের বই পুড়িয়ে তারা বিজয় উৎসব করল।

নিপীড়নের পরে বোমা ফাটিয়ে বিজয় মিছিলের সময় তাদের নিজেদেরই বোমার আঘাতে মারা গেল কৃষ্ণরায় নামে বেলেঘাটার এক সুপরিচিত গুণ্ডা। যার 'হত্যার' দায়িত্ব সুপরিকল্পিত ভাবে চাপান হলো বিপ্লবী ছাত্রদের উপর।

যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীদের সামনে পরের দিন (১৪ই মার্চ, ১৯৬৯) প্রেসিডেন্সী কলেজে হলো অত্যাচার, সাধারণ কর্মচারীদের উপর ফ্যাসিস্ত হামলা। নোটিশবোর্ড ও অন্যান্য আসবাবপত্র ভাঙ্‌লো গুণ্ডাবাহিনী। হাসির কথা—প্রমোদ বাবু হিন্দু হোষ্টেল ও কলেজে হামলার দায়িত্ব চাপালেন 'নকশালদের' উপরে। কংগ্রেসও যুক্তফ্রন্ট যে টাকার এপিঠ ও ওপিঠ বুঝতে দেরী হলনা আমাদের।

আমাদের কথা

ছাত্র সংসদের বিবৃতি

মুক্ত দুনিয়ার মহান নেতা সভাপতি মাও সেতুঙ বলেছেন—"সেদিনের আর বেশী দেরী নেই, যেদিন মানুষের উপর মানুষের শোষণ বন্ধ হবে, সমস্ত মানুষ মুক্ত হবে"।

এই শোষণ মুক্তির পথে—আগামী শোষণ মুক্তির উৎসবে সামিল হয়েছে শোষিত মানুষ—ছাত্ররাও যা থেকে পেছিয়ে নেই। অবশ্য একথা পরিষ্কার হওয়া দরকার যে ছাত্ররা কোন আলাদা শ্রেণী নয়। সুতরাং শোষিত মানুষের লড়াই—ছাত্রেরও লড়াই।

অনুন্নত দেশের অশিক্ষিত জনগণ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের মাটি। তাই সে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছাত্র ও যুবকেরা সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের আতঙ্ক। কারণ ছাত্র ও যুবকেরাই প্রথমে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং মাও সেতুঙ-এর চিন্তাধারা অধ্যয়ন করে ছড়িয়ে পড়তে পারে শ্রমিক এবং দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে। পারে তাদের সাথে একাত্ম হয়ে গ্রামে গ্রামে লালঘাঁটি গড়ে তুলে সাম্রাজ্যবাদ আর সামন্ততান্ত্রিক শোষণের মূল উপড়ে ফেলে জনগণতান্ত্রিক দেশ সমাজতান্ত্রিক দেশ, গড়ে তুলতে।

এহেন অবস্থায় ছাত্রদের বিপ্লবী চেতনা দমন করার জন্য সাম্রাজ্যবাদ 'ফিকির' বার করেছে। সাম্রাজ্যবাদ আর সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ তথাকথিত ভালো ছেলেদের (সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষায় শিক্ষিত) "বৃত্তি" নামক সাম্রাজ্যবাদী টোপ দিয়ে নিয়ে যায় তাদের দেশে (সাম্রাজ্যবাদ নিজের দেশের জনগণকেও শোষণ করে)—তাদের "সবরমতী ঘাটে" মাথা মুড়োতে।

যেহেতু সাম্রাজবাদ পরাধীন দেশের সমস্ত ছাত্রদের "বৃত্তি" দিতে পারে না—সেহেতু সাম্রাজ্যবাদ আর সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ পরাধীনদেশের ছাত্রদের দিয়েছে—"ব্যাপক বৃত্তি", "ছাত্র-ইউনিয়ন" যার নাম।

আমরা, ছাত্ররা মনে করেছিলাম, বোধহয় এই ছাত্র-ইউনিয়নে গিয়েও

ছাত্র আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। কিন্তু আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা আরেকবারের জন্য প্রমাণ করল যে এই ছাত্র-ইউনিয়নগুলো ছাত্রদের বিপ্লবী-চেতনাকে শান দেওয়ার পরিবর্তে ভোঁতা করতেই সাহায্য করে। ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)'র শ্রদ্ধেয় নেতা চারু মজুমদার কত সঠিকভাবে বলেছেন—"কলেজ ইউনিয়নগুলো ছাত্র-যুবকদের বিপ্লবীপ্রতিভাকে নষ্ট করে, শ্রমিক-কৃষকের সাথে একাত্ম হওয়ার পথে এগুলো হলো বিরাট বাধা।" ১৯৬৬-৬৭ সালের প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের ঐতিহাসিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে কমরেড মজুমদারের ঐতিহাসিক উক্তিটির সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের প্রতিস্তরে ব্যাপকভাবে ছাত্র-যুবকেরা অংশ গ্রহণ করা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের জাতীয়মুক্তি সম্ভব হলো না কেন ?—বন্ধুগণ, আপনাদের চিন্তা করে দেখতে বলি, যে সমস্ত ছাত্র-যুবক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা কি ব্যাপক শ্রমিক এবং দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের সাথে একাত্ম হতে পেরেছিলেন ? বন্ধুগণ, আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে সূর্যসেন, ট্যাগরা বল, লোকনাথ বল, রজত সেন প্রমুখ সন্ত্রাসবাদীদের সততাকে স্বীকার করে ঘোষণা করছি যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল ব্যর্থ হয়েছে এই কারণে যে সঠিক রাজনৈতিক পথের নিশানা সেদিনকার সৎ বিপ্লবীদের কাছে ছিল না। তাই গণেশ ঘোষকে আজ যেতে হয়েছে পরাধীনদেশের 'পার্লামেন্টে' (শ্রমিক-কৃষকের সাথে একাত্ম হওয়াতো দূরের কথা !)। কৃষক জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে জোতদার-জমিদারদের (শ্রেণী-শত্রুদের) খতম করার রাজনৈতিক লাইনই জাতীয় মুক্তির পথ। বন্ধুগণ, আমাদের জন্মভুমি ভারতবর্ষের ১৯৩০ সালের আন্দোলনের কথা স্মরণ করুন। সেদিন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের মুখপত্র মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধীর সমস্ত ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ভেঙে যুবছাত্ররা যাত্রা করেছিলেন সশস্ত্র পথে। তাসত্ত্বেও সে আন্দোলনে তাঁরা জয়যুক্ত হতে পারেননি সেই একই কারণে ; ব্যাপক শ্রমিক-কৃষক মেহনতী জনগণের সঙ্গে একাত্ম না হতে পারার দরুণ।

সভাপতি মাও বলেন—"দৃষ্টান্ত স্থাপন করো।"

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি আমাদের প্রিয় নেতা কমরেড 'কাকা' (অসীম চট্টোপাধ্যায়) এবং আরও অনেকে ভারতবর্ষের যুবছাত্রদের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের ঐতিহাসিক আন্দোলনের জোয়ারকে নয়াসংশোধনবাদী বি. পি. এস. এফ-নেতৃত্ব সাময়িক ভাবে ঢাকা দিলেও সে জোয়ার আজ গোপীবল্লভপুরের কৃষক সংগ্রামের জোয়ারে প্রাণ পেয়েছে নতুন রূপে—শোষণমুক্তির শপথ নিয়েছে—লালপৃথিবী—লালভারতবর্ষের উদ্‌বোধনে বলীয়ান হয়েছে।

ভারতবর্ষের যুবছাত্ররা এই **প্রথম** দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের সাথে একাত্ম হয়ে অত্যাচারী জোতদারের (শ্রেণী শত্রুর) রক্তে জনগণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষ গড়ার শপথ লিখেছেন।

ভারতবর্ষের যুব-ছাত্রদের প্রতি ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড চারু মজুমদারের "শ্রমিক এবং দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের সাথে একাত্ম হও, একাত্ম হও একাত্ম হও"—উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে গোপীবল্লভ পুরের দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের সাথে একাত্ম হয়ে যুবছাত্ররা জেগে উঠেছে।

আজ ভারতবর্ষের যুবছাত্রদের কাছে দুটি পথ—একটি নকশালবাড়ীর আলোতে উদ্ভাসিত গোপীবল্লভপুরের পথ, অপরটি ছাত্র-ইউনিয়ন-এর পথ। একটি বিপ্লবী পথ, অপরটি প্রতিবিপ্লবী পথ। হয় শ্রমিক কৃষকদের সাথে একাত্ম হয়ে জনযুদ্ধের পথ গ্রহণ করা, অথবা ইউনিয়নবাজীর সংশোধনবাদী রাজনীতিতে আবদ্ধ হয়ে থাকা। এর একটিকে গ্রহণ করতেই হবে।

আমাদের দেশে বিপ্লবী যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে। আজকের দিনে শহরের বুকে আমাদের সমস্ত কাজকর্ম হবে গ্রামের বিপ্লবীযুদ্ধের পরিপূরক। এরমধ্যে সংশোধনবাদী রাজনীতি বা প্রকাশ্য গণ-সংগঠনের কোন স্থান হতে পারে না। তাই আমাদের রণনীতি হবে কলেজ নির্বাচনকে বয়কট ক'রে শ্রমিক এবং দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষকের সাথে একাত্ম হয়ে সশস্ত্র জনযুদ্ধের পথ গ্রহণ করা !!

নকশালবাড়ীতে সশস্ত্র পুলিশদলের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে নিহত প্রথম
গেরিলা শহীদ কমরেড বাবুলাল বিশ্বকর্মকার।

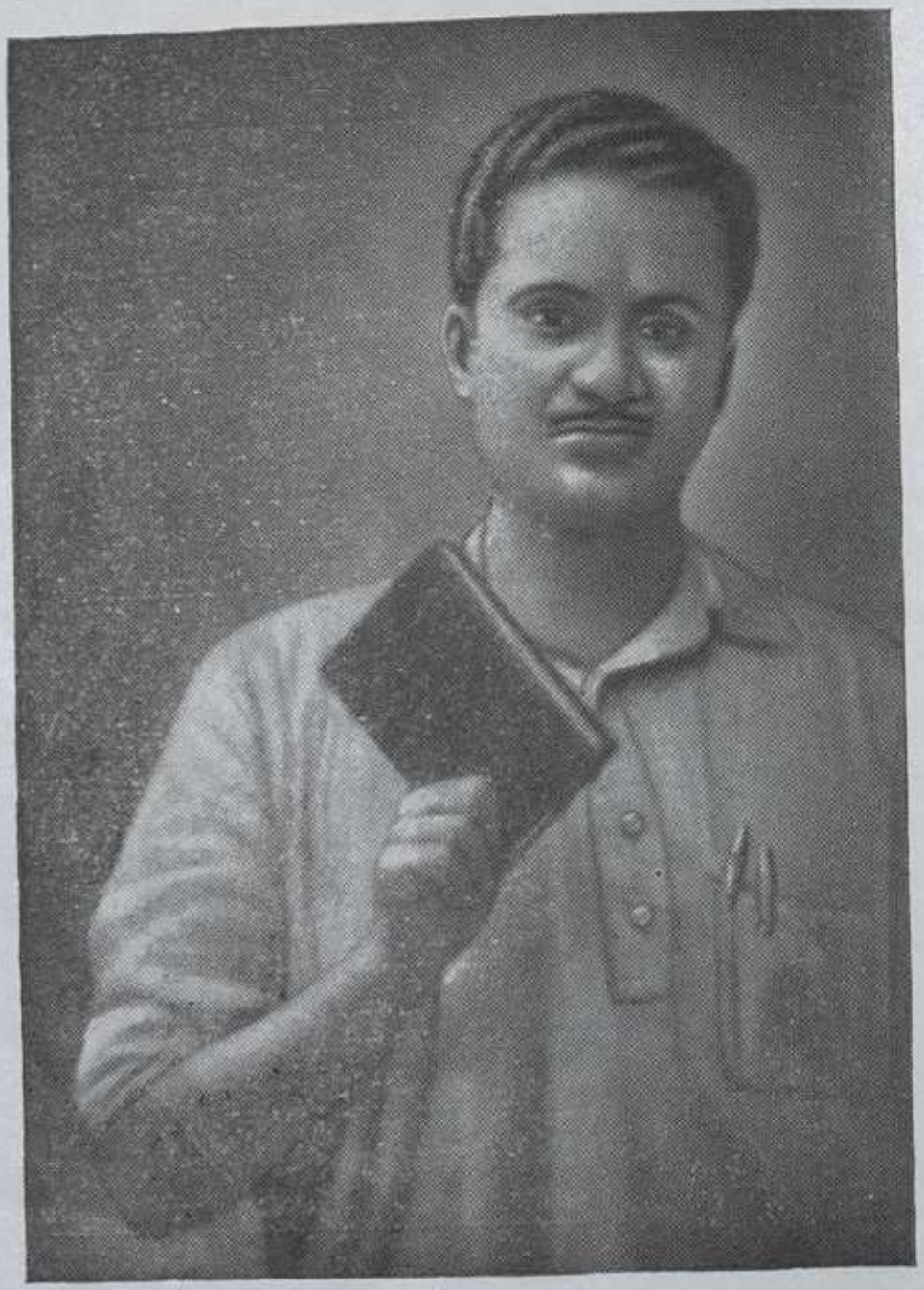

"আমাদের হত্যা করে বিপ্লবের গতি রোধ করা যাবে না"

—পঞ্চাদ্রি কৃষ্ণমূর্তি

Family Planning : A Conspiracy

Sumantra Kumar Guha
Second Year, Chemistry

The slogan of Family Planning has become the catch-word of various groups working under the present ruling class in India. There has been a mushroom growth of family-planning centres in and around the vast rural areas of our country. Peasants have undergone family-planning measures even under duress in many of the rural districts of West Bengal. Even firebrand "Marxists" like that stutterer of Kerala offer "family-planning" as a panacea for all evils of the century.

But the fact remains that the hue and cry raised over that supposed bug-bear "population explosion" is just an attempt to camouflage the real crux of the problem viz. , the socio economic set up of our country.

Our country is a semi-feudal and semi-colonial country. Its semi-feudal nature is evident from the fact that more than 80% of the Indian population fall under the category of "rural masses". This shows that the urban population viz. , the industrial workers, constitute a very small percentage of our total population. Since 1951, even though there has been an increase in the total urban population its ratio to the total population of the country is still the same. The imperialists and their lick-spittle lackeys i. e, the comprador bureaucrat bourgeoisie (which rule our country) attribute this phenomenon to the alarming "population explosion", with a view to conceal the naked semi-feudal, semi-colonial structure of our social set-up. But facts cannot be concealed. The growth of industry in this country is being stiffled owing to increasing imperialist pressures. The imperialists and social-imperialists, eager to maintain India as a constant source for cheap raw materials, are fighting tooth a d nail to prevent an independent industrial development in this country. This move is guided by the economic platitude that the imperialist's market will suffer a

of Asia, Africa, Latin America and Oceania must wage a bitter struggle to a nnihilate the imperialists and their lackeys and march towards freedom and prosperity.

---

1. It must be borne in mind however, that India is a semi-feudal semi-colonial state and not a feudal state. In other words the classical production for local consumption form of economy is absent. However all other forms of feudal oppression viz. landlessness of peasants, usurious exploitation, religious and social oppressions, are dominant in our countryside. To crown it all there is that natural inertness in the economy. The landowner has no wish to increase production very much. As a result he never grows more than one crop a year. Thus as Marx analysed "here no boundless thirst for labour arises" and production falls behind population increase.

2. *Capital*, Vol. I, p. 260 (Kerr edition).

"The Communists disdain to conceal their views and aims. They openly declare that their ends can be attained only by the forcible overthrow of all existing social conditions. Let the ruling classes tremble at a Communistic revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win,

WORKING MEN OF ALL COUNTRIES, UNITE"

—K. Marx & F. Engels

[Manifesto of the Communist Party]

"The Arguments of Student Unrest : Words For The Authorities"

Kalyan Chatterjee
Third Year, Political Science

While writing this article, I am reminded of a three-day conference of student leaders from about 60 Universities sponsored by the Education Ministry and the U. G. C. Commenting on the outcome of this conference one Mr. Narendro Aggarwal stated in *The Statesman* (Letters to-the-Editor Section, June 5-6) that this conference could have made history. It was for the first time that an all-India student leaders' conference was jointly convened. The Education Minister, Dr. V. K. R. V. Rao and the U. G. C. Chairman, Dr. D. S. Kothari, were present throughout the proceedings to give a patient hearing to the grievances of the students. What did the students say? The conference offered the opportunity of establishing a dialogue between the students and educational authorities. But instead of discussing student problems and the issues concerning student welfare, the "self-styled student politicians" engaged themselves in political diatribes. They were more interested in debating political ideologies than in passing high sounding, wise resolutions. A ceiling on income and expenditure was demanded. Among other items of discussion was the demand for state takeover of banks. The issue of official language was also raised. "I will speak in Oriya", shouted one of the delegates. To cap it all, attempt was made to denounce the capitalist system. Mr. Aggarwal concludes that the people at large will realize that these students do not represent the aspirations of the majority of the students or the youth of the country.

An article, captioned "A Basically Wrong Approach To Student Problems" by one Mr. P. C. Malhotra was published in the same newspaper on June 14. The writer of this one-sided article condemned, just as Mr. Aggarwal had done, the students for participating in active politics. It is a pity, he stated, that student problems

are discussed and attempted to be solved on the footing of labour problems. Those who are trying to import trade-union concepts into the academic world "are ignoring the dangerous consequences." The majority of students will remain indifferent to such ideas and the real beneficiaries will be "those students who consider Universities as good training ground for their future political career." The first mature step, therefore, in adopting remedies for educational ailments will be to de-politicize the student problems. The prevailing situation in the College and University campuses is best described as "the dictatorship" of a group of self-styled student revolutionaries which leads to a "fascist-type back lash." A democracy cannot afford to encourage this trend.

As we see, both Mr. Aggarwal and Mr. Malhotra are dead against the politicization of student problems. Both seem to hold the traditional view that the foremost task of the students is to study inside the locked-room. Politics is nasty business, and students must keep away from it,

If we just pick up a copy of any newspaper or a mass circulation journal we will easily see that at least one of its columns contains materials on student unrest all over the world. New Delhi spares no pains simply to convince us that we should consider politics as the last resort of the scoundrel and therefore should keep away from it. it. But despite this spate of printed matter. the press in India and the ruling class are profoundly ignorant of the realities of the problem. They know next to nothing about the origin of the student unrest ; the image they hold of the present-day student community is distorted to the point of falsehood ; and the vision they have of its future is quite unrelated to the factors and forces that are shaping the destinies of the thousands of students of India.

Almost all the political commentators condemning the students for resorting to politics, do present facts wrongly. As to Mr. Aggarwal's view that the "self-styled student leaders engaged themselves in political diatribes," it may well be said that the student leaders who joined the conference were not at all "self-styled". They were mostly elected student-union representatives.

Secondly, it is not true that they did not discuss their own problems or offer any fruitful suggestions. There had been hot exchanges of ideas among them indeed, but they did pass some important resolutions connected with our educationl system. And in doing so, they showed commendable maturity. Take for instance the controversial issue of student participation in the administrative bodies of the Universities. They stressed the need for their participation in academic and administrative affairs, including syllabus and examination reforms. They wanted to replace the present examination system which encourages selective study and browsing and cramming, by an examination system which would assess the individual progress of the students in a comprehensive manner, with emphasis on objective tests and problem-oriented constructive questions. This was of course a wise suggestion.

It is true that the students of to-day are more involved in practical politics than they were, say, two of three generations ago. But have we ever made any genuine attempt to find out the reasons why they engage themselves in politics? Have we ever tried to dig deep into the causes behind student unrest? Let us not take that hidebound and sanctimonious attitude which has created the present rut in the field of education. Let us 'sincerely' seek out the causes of student unrest. I think there are three factors to be considered. The first is economic. Our ecenomic system is such that the students see no hope of a bright future. They know that the govt. will do next to nothing for them when they leave their Universities or Colleges as the case may be. They are always assured of jobs by the would-be MLAs before every election. But as soon as the election is over, the MLAs forget their assurances and all become rarely-visible VIPs. Unemployment among them is daily increasing. A recent survey has revealed that only in West Bengal, more than four lakh people are unemployed. Their hope that things will improve for them is confronted with the reality of things getting worse day by day.

The second factor is psychological. Many of the students, who wander about in the streets, get no jobs, and see no possibility of economic progress, are becoming disillusioned, frustrated, and

alienated in the most profound sense. The have lost their sense of belonging to a community.

The third and the last factor is, of course, the "revolution of rising expectations." Students had hoped that the govt, would provide them with suitable jobs after their University days. But their actual experience fell far short of their expectation. They found, however, that they were not getting full economic equality and that their Assembly dads were reluctant to listen to their grievances. Their hopes after first being aroused, have been thwarted—a classic revolutionary situation.

There is no attempt at an objective study of the question of student unrest in the perspective of the changing conditions of the society. One ought to realise that no amount of firmness or high handedness could any longer sub-due the students to that state of obedience which prevailed in the past. Students in the past did not live in such a state of moral and ideological anarchy as they do now. They had some sort of idealism in them and "the spectacle of social injustice was not so glaring." Today they are quite uncertain of their future. Naturally they become restive and resort to violence. They do all these things not because they think that they are above the law, but because they have lost their faith in the bourgeois concept of 'law' and 'legal justice.' The laws of the land seem to them to be themselves 'illegal"

There is nothing in our educational system which the students can be proud of, and when they demand a productive educational system, they do not utter cliche's, but just express their utter disappointment with the present educational system. It is the ruling class who utter cliches when they preach that a student "has to be more at the receiving end than the ordering end." Can we honestly expect them to be content to be at the receiving end when they cannot possibly expect anything worthwhile ?

Not all the students at the conference talked politics. Some of them of course waxed revolution Some talked fire. They were a mixed bag. But one common feature characterised their speeches. Nearly all of them wanted jobs. All

of them demanded their right to work guaranteed. They all understood the simple fact that the educational system of a country is inextricably inter-woven in its socio-political structure And that is why they talked politics, suggested largescale reforms, and censured a planning-system which fails to prevent the mounting tide of unemployment. If they talked politics that is simply because the "ivory tower temples of learning" are not self-sustaining islands in the society.

Violence ? You, the ruling class, cry to heaven, wring your hands, weep before violence and bloodletting Yes, unfortunately it has never been possible to persuade the ruling class and their agents in the educational institutions who call themselves "authorities" or "respectable persons", that their last hour has come. I am not making any plea for violence or rowdyism. But I do hold the view that violence arises out of an accumulation of emotional frustration and hatred among the student community. And it is a matter of 'must'.

You, the ruling class, you suggest "depoliticization" of the student problem as the first mature step towards mitigating educational ailments. My friends, you are all fools. How can you depoliticize an issue which is so closely associated with the socio-political structure of thec ountry ? Friends, you talk of democratic means of solving the educational problems, but whenever there arises a need for stabilizing your authority and spreading your exploiting grip over the educational institutions, whenever you are opposed in acting according to your sweet will, you do not hesitate to let loose the Police goondas. You do not feel even for a moment that the virgin sanctity and purity of those institutions will be destroyed in toto. Do you mean to say that you allow the police to rape the educational institutions just to save democracy ? Do you talk of 'democracy', 'constitution', 'justice' when the revolutionary students are severely beaten up by the police in custody ? Why do you try to justify the police atrocities in the "sacred" educational institutions ? Where is your democracy ? Could you kindly give a convincing reply ?

The student unrest which is boiling up in scores of university campuses, has therefore, in my opinion a good deal more justification

than one might collect from press accounts. Some commentators have put the blame on a handful of self-styled romantic Guevaran revolutionaries or New Leftists, playing at revolution ; or on indecisive academic administrators, or on the contageous epidemic of student unrest as a whole which is sweeping the world today. All of these elements are in the cauldron indeed, but they are not the only ingredients. They would not have produced such widespread unrest unless a considerable part of the student community felt a a deep sense of grievance. And with justification and good reasons of course. What do the students want ? Understand this : The students want to have "a visible relationship between knowledge and action, between the questions asked in the class rooms and the life they live outside it" (Jencks and Riesman) [1] But instead they get "pedantry and alienated erudition". It is therefore no wonder if they are "turned off" and convinced that all systematic formal intellectual effort is just "a waste of time".

A short term solution, as some university authorities are beginning to realise, is to hand over to the students, a great share of responsibility. That is to say, students are sought to be accomodated in the administrative bodies of the university. But stunents' participation in the university affairs poses some practical problems. How should they be chosen ? By simple choice by the university faculty, or by the system of election ? If the former method is adopted can anybody assure that it would not pave the way for rampant nepotism ? Election of the student representatives is perhaps the last possible system that the University authorities will approve of, lest it might destroy the conservative clique inside the University.

And so student participation as a feasible solution of the problem of student unrest is not a practical proposition. It may be a temporary remedy but in the long run it will usher in confusion and chaos. Moreover even if the students are allowed to exert full control over the administrative machinery of the University, the educational system as such will not be totally changed. The vested interests will oppose all sorts of educational reforms. The student representative may suggest the replacement of a back-dated text book by a relativelys modern one, but the suggestion will never

be carried out in practice for the professors whose canvas of knowledge is very small may not approve of it. The only permanent solution therefore is to destroy the present educational system which is the by-product of the social structure of the country, and build a new one upon its grave. A perfect and democratic educational system is never possible unless there is people's democracy in India. And people's democracy can only be brought through an agrarian revolution. This agrarion revolutian will not only aim at abolishing the evil legacies of feudalism, but also stamp out the last vestiges of neo-imperialism. The students know their way.

The students will no longer be the victims of exploitation of the University authorities. After years of experience they have come to know that if they remain idle any longer, their dream of a sun-lit future will be shattered by the authority somehow or other. And idle they can never be.

Yes, Revolution ! That is the only solutin of all educational ailments. Sacrificing democracy through revolution ? Not if there has been no democracy in India. It has been democracy on paper and rhetoric. Secrificing human rights ? Which ones ? Those of the hungry, valiant, vagabond people ? Sacrificing freedom of the press ? Not if there has been no such thing ; there is a corrupt press at the service of the interests of the ruling class. Those who do not like revolutions or students' involvement in politics or think that the future of India will be democratic have adopted the posture of a modern King Canute desperately trying to command the revolutionary waves to subside. Revolution can not be stopped. It is inevitable. You, the ruling class, and your henchmen in the educational institution, do not worry.

(The "Academic Revolution" quoted from *Span*, Vol. X, No 7, July, 1969.)

"In class society everyone lives as a member of a particular class, and every kind of thinking, without exception, is stamped with the brand of a class".

—Mao Tse-Tung

[On Practice]

A Note On Bank Nationalisation In The Context Of Indian Political Situation

Tarunkanti Das
Second Year, P. G. Economics

Although nationalisation of banks has been acclaimed by almost all the political parties of India, we fail to understand how it would bring about "the fulfilment of the hopes and aspirations of the millons of toiling people of India." It is quite clear that the resignation of Mr. Desai from the union cabinet and the nationalisation of banks are the outcomes of the prolonged conflict between two major groups of reactionary rulers at the centre. These to groups belong to different ideological and political platforms and have followers and supporters both inside and outside the Congress party. Under these circumstances, Mrs. Gandhi's reactionary group (the other group is also equally reactionary) in associating itself with the revisionists and neo-revisionists has undertaken the hasty step "to nationalise" 14 major banks of India. In the background, there are the big hands from both the American imperialists and Soviet social-imperialists.

Let us make these points clear to all. We have observed that the other group implemented social control on banks and according to the assessment of the Reserve Bank of India the achievements of the banks under the policy were satisfactory. Still Mrs. Gandhi has adopted nationalisation but without any basic change in the policies. So it has been done only to befool the country and to create public sympathy for her group. We can easily show that the so-called nationalisation of banks is not an improvement over the social control of banks, so far as the basic criteria are concerned. The prime minister has pointed out the following objectives of nationalisation—a) removal of control by a few b) provision of finance to the priority sectors, particulary for agriculture, small-scale industries and exports. c) the giving of a professional bent to bank management d) enlargement of employment, and e) the provision of adequate training as well

as reasonable terms of service for the bank staff. The social control of banks was also implemented on the basis of these objectives. It aimed at widening the spectrum of bank advances and at promoting the social and economic objectives of the state policy. After the establishment of the National Credit Council as the supreme policy-making body, necessary and sufficient powers of the banks have been already transferred to the Council and to the Reserve Bank of India. The objective of N. C. C. was also to assert the demand for bank credits by various sectors at different times and to determine the requirements of each sector from the stand point of priorities and availabilities of loanable funds. The existing commercial banks are already making advances to the priority sectors such as agriculture, small scale and medium-sized industries according to the recommendations of the N. C. C. But these advances in most cases remain unutilised because these sectors are yet to recover from recession and they lack credit-worthiness. There is also inefficiency in planning procedures, due to which Indian agriculture remains stagnant. Hence the basic problem would remain unsolved even after nationalisation of banks.

As regards the objectives from (c) to (e) as stated above, government has already set up another Banking Commission. It has the following goals under consideration—to review the prevailing arrangements relating to recruitment, training and other relevant matters connected with manpower planning of bank personnel and to conduct an enquiry about the basic structure of the banking system. Training Colleges have also been set up by several banks in order to train thair staff. Hence nationalisation is not going to make a great deal of change in the economic situation of the country. It means simply a change of formal owenership of the banks. In reality, it is not fundamentally different from the scheme of social control. It bears no significant relation to any strategy which could he used for "the betterment of the country's economic life."

India is now going through a period of unprecedented recession. It is due to the fall in the effective demand of the people. About 80% of the total population are living in the lower income brackets and they are being continuously oppressed by the feudal elements and the big landlords. Above all there is the oppression by the foreign imperialists with the help of new colonialism. As a result,

the purchasing power of the Indian people has declined considerably, hence there is no rise in effective demand and so there is no opportunity for new investment in productive sectors. Unless something is done to remove this basic difficulty, we can never be able to pull the nation out of the great recession. For that we need an agrarian revolution, not merely bank nationalisation. Government has undertaken bank nationalisation only to mislead the people and to counteract the revolutionary tendencies prevailing in India.

There are several political parties in India who think that the mere nationalisation of any sector of the economy would accelerate the rate of economic growth and would reduce the inequality among several groups and regions. But they have forgotten that the so-called nationalisation of many sectors not only in this country but also in foreign countries has failed to achieve its goal and to bring about a radical change in the economic structure of the society. Rather they have strengthened the bourgeois state power and have led to economic stagnation, bureaucratic corruption and the lack of inertia.

In India we have nationalised more than a decade ago the Life Insurance Companies, the State Bank of India or the Imperial Bank. The politicians concluded that these sectors have been nationalised in the interest of the common men and for the progress of the greater community. But what have the proletariat and the hungry people around us gained from it? They have gained absolutely nothing. According to the report of the Hazari Commission, after the nationalisation the State Bank of India and the Life Insurance Companies have provided the lion's share of their loanable funds to only 20 big industrial houses and one of them received about 7% of total credits. Again, according to the report of the Rural Credit Survey, the nationalised State Bank has helped the big landlords and moneylenders to obtain bank credit at a low rate of interest and to lend this money to the farmers in villages at an interest rate as high as possible (ranging from 50% to 80%). The nationalisation of banks would also strengthen their policy of oppressing the toiling masses by the big bourgeoisie and big landlords, because the so-called nationalisation would enable the moneylenders to obtain additional resources to exploit the peasants. Hence the nationalisation may satisfy the mere sentiments of some political

parties, but it would not improve in any way the economic life of the common men of India, rather it would depress their economic conditions.

We must not forget that the nationalisation is the result of the basic contradiction between American imperialism and the Soviet social-imperialism. Both the American and Russian imperialists are trying to extend their control and power over Indian industries and to destroy completely the economic freedom of India. After the nationalisation, the Soviet imperialists could utilise Indian banks for their own interest and at their own wills. Again the foreign banks have been e xcluded from the scheme so that the Americans and other imperialists could retain their imperialist exploitation over India. Thus the nationalisation of banks has been implemented in such a way that both the American and Soviet imperialists could strengthen their indirect political domination. So it is nothing but a new tactic to blunt the national liberation revolution and to continue to exploit Indian peasants and other toiling people.

The defeat of the Congress in the general election of 1967 due to which it failed to form ministries in seven states in India has proved that the party has become politically bankrupt and the India people have lost their confidence in it ; so the party has realised that old tactics are not enough to befool the country and to create a favourable image for the Congress so that it could maintain its existence even after the next general election in 1972. That's why Mrs. Gandhi has declared the nationalisation of the major banks at a time when most of the political parties of India believe that the mere nationalisation of certain sectors can solve all our problems and can sustain a higher level of economic growth.

In the true sense of the term, it is not nationalisation at all. Marx never mentioned nationalisation of this type. It is interesting to note that Mrs. Gandhi has pointed out that "nationalisation" of banks has been the practice even in some "countries who do not adhere to Socialism" (read capitalist countries). The only reason for adopting nationalisation by these countries is that it strengthens the power of state capitalism. Hence it is not at all the appropriation of capital (one of the means of production)

by the state. Again, Mrs Gandhi has no intention of launching a new era of nationalisation. She is also unwilling to transfer resources which have been already employed in private sectors. Private traders and enterpreneurs have been assured that they would receive sufficient credits. Above all foreign banks have been kept untouched, although they are controlling ahout 20% of the total deposits of the commercial banks. The compensation scheme has been finalised in such a way that the shareholders would be paid a fair and equitable compensation as early as possible. The bank autonomy is kept undisturbed. Last of all, the statements made by big traders, big industrialists and bankers make it clear that they are least worried over bank nationalisation. From all these circumstances, it follows that the so-called bank-nationalisation is not a nationalisation at all.

In fact, the nationalisation of the means of production is possible only under the dictatorship by the proletariat and it is impossible under any other political structure. The peasants, the working class and the toiling people must first of all seize the power of the state (which is the highest form of organisation of the exploiting classes to control the socio-economic structure for their own class interest) in order to win their freedom and liberation. But what state power should they seize ? They must smash the existing state apparatus and should replace it by a new state apparatus of their own. But that can never be done through the battle of the ballot box. The idea of bringing about fundamental changes in the class-relation and production-relations simply by getting hold over the existing state apparatus is clearly anti-Marxist. TheIndian constitution was framed not by the elected representatives of the people but by the big bourgeoisie and big landlords. It retains all the essential components of state power such as bureaucracy, police and the military. So the elected representatives have basically no power to change the bourgeois social order and to interfere with the existing production-relations even in a limited measure. The so-called democracy in India is only a weapon of the reactionary rulers to exercise dictatorship over the working class, labouring peasants and the working youth. Even the rulers have not the full freedom to exercise the dictatorship rather they are the partners of the foreign imperialist. They are trying to damage the

revolutionary movement of the working class and the labouring peasants, and to lead them on the road of reformism and to arouse in it the spirit of passivity. This is the ugly face of parliamentary democracy as exposed in India. Under these circumstances, the only way to build socialism is to seize the state power by means of agrarian revolution, which has already begun in at least eight states in India.

Hence the Indian people should not be misled by the so-called bank nationalisation. They should not forget that in true senses of the terms India is not independent and democratic rather she is semi-colonial and semi-feudal. Internally she has no democracy but is under feudal oppression and in her external relations she has no national liberty but she is oppressed by imperialism. To throw away the so-called democracy and to liberate the toiling people, we need an agrarian revolution. First of all we have to wipe out feudalism (which is the main base of imperialism in India) in the countryside, we have to build up armed forces in the course of the struggle and then we have to capture the big cities. This is the correct line of Marxism—Leninism for the proletarian revolution and the dictatorship of the proletariat.

"Love as an idea is a product of objective practice. Fundamentally, we do not start from ideas but from objective practice. Our writers and artists who come from the ranks of the intellectuals love the proletariat because society has made them feel that they and the proletariat share a common fate.'

—Mao Tse-Tung

[Yenan forum on literature and art]

Muhammad-bin-Tughlug Reconsidered

Pijush Chakravarty

[Pijush Chakravarty came to Presidency College in 1964 and joined the History Honours class. He had stood first at the Higher Secondary Examination that year. He took his B. A. with high first-class honours in 1967. He died on 25th April 1969 after a mysterious illness. He was then reading for his M. A. in History. This article is based on a paper he read to the History Seminer.]

None of the makers of Indian History has been the subject of such conflicting valuations, as Muhammad-Bin-Tughlug who occupied the throne of Delhi Sultanate for twenty-six years, (1325 to 1351) and filled these years with activities which prove to be the greatest puzzle for any historian. While the contemporary chroniclers denounced him as a 'Zalim-Sultan' or 'Khuni-Sultan', and while the conservative writers seemed to take much pleasure in their efforts to prove him an insane monarch, there is a distinct tendency among the modern writers to hail him as'one of the ablest men among the crowned heads of the middle-age'. It is really very difficult to give the true interpretation of the policy of this sultan, who was an enigma to Barani, an enemy of Islam and friend of Hinduism to Isami, an insane person to Elphinstone and a mixture of opposites and a freak of nature to others. No agreed verdict can be pronounced on him, because his judges wear spectacles of various tints. Still, as a student of history, I venture to draw the attention of the readers to some recent reconsiderations on Muhammad-Bin-Tughlug.

Muhammad-Bin-Tughlug is generally grossly misunderstood for the fact that he has been misrepresented. He had the misfortune of having the most unsympathetic choniclers, who, for all their good intentions, took a prejudiced view of things. It is a misfortune that Ziya-ud-Din Barani, has been regarded as his apologist while Ibn Batutah, who was decidedly biased has been called an impartial journalist. Barani did not deny the merits of the sultan, for they were too well-known to be denied. But, he took care at the same time to stress all his weaknesses and faults. When, sketching his character, Barani made use of hyperbolical language and satirical

expressions. In the midst of his eulogy, he introduced sentences which produced the opposite effect in the mind of his readers. By expressing repeatedly his bewilderment in understanding him, he endeavoured to convince the readers of the sultan's innate badness. Barani never liked the sultan's liberal character and hence put down that the sultan was bound to be a failure because his character as a young man had been formed by his association with atheist philosophers.

Ibn Batutah, the African traveller. was, in all probability sympathetic towards the rebellion in Bengal and Bihar against the sultan. Then, during many years of the sultan's reign, he was absent from India. He came to India in 1333, eight years after Muhammad had ascended the throne. So, he was biased and his knowledge about the sultan was partly based on hearsay.

Isami, the writer of Futuh-us-Salatin wrote the book to please the sultan's enemies. Hence, it is not surprising that it would censure him for revolt against Islam, for making common cause with the Hindus and mixing with Yogis. Being a spokesman of the aggrieved party in the country, Isami related stories which were highly prejudicial to the sultan, stories which found wide currency among the people, and were later heard by Ibn Batutah. Isami called the sultan a 'wretch', denounced him for his insincerity and for his revolt against Islam.

So, of these three main chroniclers, one was a religious fanatic, the other an intriguing Qazi, while the last one was the chonicler of a rebel against sultan Muhammad. Any view, based on the uncritical acceptance of the narratives of these chroniclers is bound to be fallacious.

Muhammud-bin-Tughlug was the most learned sultan who ever sat on the throne of Delhi. Nature had endowed him with a marvellous memory, a keen and penetrating intellect and an enormous capacity for assimilating knowledge of all kind. The versatility of his genius took his contemporaries by surprise. A lover of the fine arts, a cultured scholar and an accomplished poet, he was equally at home in logic, astronomy, mathematics, philosophy and the physical sciences. No one could exceed him in composition and calligraphy ; he had at his command a good deal of Persian poetry,

of which he made a very extensive use in his writings and speeches. Even the most practised rhetoricians found it difficult to rival the brilliance of his imagination. Even Barani described him as an eloquent and profoundly learned scholar, a veritable wonder of creation, whose abilities would have taken by surprise such men as Aristotle and Asaf. He was highly generous, and all contemporary writers are unanimous in extolling his lavish gifts to the numerous suppliants who crowded his gate at all times. Batutah says, "there may always be seen at his gate poor persons becoming rich."

These contemporary writers devoted great space and attention to prove that the sultan was a blood-thirsty-tyrant. Ibn Batutah is in complete accord with Barani that the emperor was most enthusiastic in the shedding of blood So many men were put to death that in the exaggerated analogy of Barani, their blood poured in torrents almost evey day before his palace. Ibn Batutah said that his door was never free from an indigent person to be enriched and a living person who was to be slain. He added "the Sultan had an immense daring (sic) to shed blood." A study of the sultan's plans and programmes leaves us in no doubt that he was an idealist. He was, in the words of Ibn Batutah, the humblest of men, and we may conclude, that he was perhaps a hater of violence and bloodshed. Yet, his campaign for the discovery of truth, and his anxiety to stop evil at its source and administer justice and equality had brought him into conflict with a body of people whose fault was unpardonable in his eyes. He let his conscience be guided by his reason. Like Robespierre, he was not naturally inhumane or tyrannical, and his tyranny was something that grew out of his own idealism, a moral fanaticism, which swept aside all human feelings. In his conversation with Barani, he said, 'This I will do, until the people will act honestly'. Thus, he was not fond of shedding blood for its own sake, and he could be just even to his enemies.

When his subjects failed to responed to his noble wishes, his wrath was terrible. We should also remember, in this context, that such bloodshed and violence as we find in his reign, was nothing new in the medieval world. Punishments were severe in his days both in Europe and in Asia. Balban was terribly cruel at times.

Alauddin Khalji, in the words of Barani, shed more innocent blood than even the Pharao was guilty of. Most of the medieval rulers were subject to paroxysms of rage and inflicted inhuman punishments on those who offended against their will. Even, Akbar the Great after the fall of Chitore, ordered a general massacre in which 30,000 men were slain in one day. Hence, this charge of blood-thirstiness against Muhammud-bin Tughlug in particular seems to be unfair.

His reign is said to have been marked by reckless prodigality and attempts to carry out hare-brained schemes, the chief of which were the transfer of capital, from Delhi to Daulatabad, his introduction of token currency, his ambitious designs for the conquest of Khurasan and his Quarajal expedition. Elphinstone says that the execution of these reforms were accompanied by a perversion of judgement on an intoxication for absolute power. A little sympathetic consideration will however show us that the policies were well-planned and the sultan was sincere in their executions, but his idealism again misled him. He lacked a sense of balance and moderation, but never a sense of judgement. This will be quite evident from a short explanation of his programmes.

Muhammud-bin-Tughlug, was, by nature, resourceful and fearless. He sought to solve the new problems as they arose. The problem of keeping the Decan under the control of the Delhi-Sultanate was indeed a big problem. Had he inherited a small kingdom like Iltutmish or Balban, his dominions might have escaped disintegration. The means of communication then available could not maintain the authority of a centralized power at Delhi over so large an area. Then, Delhi was very near the north-western frontier. The Mongols might attack all on a sudden, come near the capital and create panic and confusion there. Gardner Brown points out that for a hundred years Mongol invasions had devasted the Punjab and their centre of gravity had shifted southwards. All these considerations, were present in the Sultan's mind and so he might have desired another capital centrally situated.

It is clear that the change was not dictated by the mere caprice of a cruel despot. Ibn Batutah's statement that the people of Delhi dropped anonymous letters full of abuse into the king's

Dewan, and the king took so much offence at this that he ordered the capital to be changed, is based upon hearsay, for when the transfer took place in 1326-27, Batutah was not present in India.

The conservative historians, on an uncritical acceptance of Barani's biased statement, generally believed that the plan was carried out ruthlessly, Barani writes—"so complete was the ruin, that not a cat or a dog was left among the buildings of the city, in its palaces or in its suburbs". A statement of this kind made by an oriental writer of the middle ages is not to be taken too literally. In fact, Barani contradicts himself and tells us that only a portion of the polulation went to Deogir. Barani says that the project brought destruction to the capital city and, in his words "misfortune to the upper classes, as well as decline of the select and distinguished people." It clearly implies that the common people had not to go there. Two Sanskrit inscriptions of the years 1327 and 1328 tend to confirm this. The inscriptions praised the sultan and said that the Hindus were living happily near Delhi. It is supported indirectly by Isami who regarded the sultan as a scourge sent by God to punish the Musalmans of Delhi. The author of *Mutalub-ut-Talibin* tells us that the sultan forced only the 'Buzurgan-i-Delhi' or the leading men of Delhi to go to Deogir. There is no reference to the common people and we may say that there was no wholesale evacuation.

Did Delhi cease to be the capital even after 1327 ? Perhaps not. In 1329, when the sultan proceeded from Daulatabad to put down Kishlu Khan in Multan, he stopped at Delhi, stayed there, raised an army from the local people and then marched again. That Delhi was still the capital is maintained by the Tarik-i-Mubarakshahi. "The Sultan", says the author, "returned from Multan to the capital Delhi." Badauni repeats the same tale. It may be added here that constructive works were carried out in Delhi even in 1339. Shaikh Mubarak, who had visited Delhi just after the so-called transfer of the capital. informed the authors of *Masalik-ul-Absar* that Delhi was the capital and a city of first-rate importance. We must say that the picture of destruction, given by Barani, is wholly exaggerated. The sultan never meant to replace Delhi by Deogir, but to raise Deogir into a new or second capital by taking it under his personal change as long as circumstances permitted.

The methods adopted by the sultan to execute his plan were constructive and philanthropic rather than destructive. It must be confessed, however, that the plan eventually failed and the sultan permitted the emigrants to return to Delhi. But, the plan failed not because of any inherent defect in it, but for the opposition of the nobles, ulamas and the hostile chroniclers, who, by their exaggerated description, created a panic among the public. The sultan was modest enough to bow to popular will. Had the people understood his real intentions, the scheme would have been a great success, and the history of India would have been different. It is a tragedy that his noble intentions were frustrated by some narrow-minded ulamas and amins.

Of all the motives ascribed for the introduction of the token currency—the depletion of the treasury according to Barani, money for the sultan's ambitious schemes of conquest according to Firishta, the great outlay involved in the transfer of capital, according to Barani—the crisis caused by the recruitment and maintenance of large armies for for the Khurasan and Quarajal expeditions, as well as the shortage of silver seem to be the most reasonable and sound. He knew the weakness and instability of the Khalji economic system and abstained from repeating the Khalji fiasco. He had studied the history of credit currency in China and Persia, and was possibly tempted by the Chinese to try the experiment. It is a mistake to regard his attempt as the result of bankruptcy. Barani, who must have been an eye-witness, carelessly remarks that the Sultan's bounty and munificence had caused a great deficiency in the treasury. That the treasury was full of riches is confirmed by the fact that the emperor, after the failure of the token currency had enough gold to pay in exchange for all copper coins, genuine or spurious.

It should be noted that silver in India has always been a rare metal. Col. Yule says that in the 14th century, the relative value of gold and silver should have been ten to one or even less. Gardner Brown says that the 14th century was a century of shortage of silver throughout the world. Hence, some change in monetary system was necessary.

The Sultan was a man of genius who delighted in originality and loved experimentations. Copper coins were introduced and made legal tender. Isami charges the Sultan with dishonest intentions

but, the legends on his coin prove that the sultan had not the slightest intention of defrauding or cheating his subjects.

The scheme was, on the whole, reasonably good and statesmanlike, but it failed in the hands of the emperor despite his good intentions. He had not made the issue of the coins a state monopoly. The result was, as the contemporary chronicler points out in right orthodox fashion, that the house of every Hindu was turned into a mint, and lakhs and crores of coins were manufactured here and there. The state was constantly defrauded, trade came to a standstill, all business was paralysed. Great confusion prevailed, merchants refused to accept the new 'coins' which "became as valuless as pebbles or potsherds". The emperor, whose honesty of intention, cannot be questioned, recalled all the copper tokens and exchanged them at their face value. All forgery was thus stopped. Thus the sultan managed a most difficult situation with astonishing success. All panic ended. The people were so gratified that not a murmur about it was heard by Ibn Batutah, who arrived in India shortly after.

Thus, the Sultan committed a benevolent blunder. On the otherhand, never were benevolent schemes of refom more cruelly frustrated by the people, who misunderstood his real intentions. The unlettered masses, who received the coins in great number raised disturbances and thought that the emperor was going to cheat them. We should also remember that this experiment was the first of its kind in India, and we should not expect a complete success. The Sultan should not be blamed for the failure of the scheme, which was inevitable in India of the fourteenth century. He should be admired for the novelty of the plan, boldness of its execution and for his wisdom to repeal his former edict as soon as he found out his mistake.

Some of the historians persist in calling him a born-tyrant and an oppressive ruler. They refer to the enhancement of taxation in the Doab and the rebellion of the inhabitants, as their evidence. Barani describes it repeatedly, and impresses upon the reader the atrocious regime based on a policy of high exaction and exorbitant demands introduced in the Doab. Barani, whose native district also suffered from effects of enhancment, bitterly inveighs agaist the sultan. To him, it was the greatest of the sultan's blunder and operated to the ruin of country and and the decay of the people",

The Sultan led punitive and man-hunting expeditions and 'ruthlessly murdered the ¡nhabitants'.

All the later writers have followed Barani, Yahigar-bin Ahmad Nizam-ud Ahmad, Badauni and Firishta. But none of the other contemporary writes, Isami, Shiab-ud-din Ahmad Abbas, Ibn Batutah has a word to say on the Doab rebellion. Why would they seem to have heard nothing about the increased taxation and dreadful oppression ? It seems that Barani's account is highly exaggerated. The taxation imposed by the sultan was not heavy. Alauddin Khalji had raised the state demand to fifty percent of the produce. It was reduced. Qutub-ud-udin Mubarak Shah and later by Ghiyas-ud-udin Tughlug. From that reduced demand of his father, which was ten per cent, Muhammud raised it to double the amount.

But at this time the rains failed and prices soared. Because of the drought, the usual convoys of coins ceased to come from different parts of the Doab. The disbanded troops of Khurasan army, who were staying in the Doab, grew restive. They not only refused to pay the taxes but also ceased to work. Haji Pir Dabir informs us that they killed some tax-collectors. The sultan grew angry and inflicted exemplary punishments on many of the leading men. The other ring-leaders fled to the junglesbut were attacked by the sultan's army and surendered.

Hence, the Doab rebellion is the most grossly misunderstood of the rebellions. The sultan had only done what a reasonable despot might be expected to do. He had no control over the circumstances that happened. In order to keep peace and order and restore normalcy such severe steps as the sultan took, were extremely necessary.

Muhammud Tughlug adopted a policy which ran counter to the cherished prejudices of the orthodox school. He showed a greater regard for the religious susceptibilities of the Hindus than his predecessors had ever done. Unlike his weak-minded cousin Firuz, he was no unreasonable bigot. His culture had widened his outlook, and his discussions with the philosophers and rationalists had developed in him a spirit of tolerance for which Akbar is so highly praised. He employed some of them in high positions in the state. Ibn Batutah speaks of a Hindu, Ratan by name, who was in the Sultan's services. The liberalism of his character isreflected in his human attempt to abolish the custom of 'satidaha' which was in

vogue in the 14th century. The feelings of the ulamas were deeply embittered when he deprived them of the monopoly of justice. He laid his hands freely upon the members of the priestly class when they were found guilty of rebellion, sedition or embezzlement of public funds. Neither birth nor rank availed to afford protection to an offender from the punishment which his guiltmerited. His love of justice was so great that he personally looked into the details of the judicial administration and submissivelyaccepted the decrees of the courts passed against himself. That recorded the verdict, is why, Ibn Batutah, who had seen a great deal of men and affairs, when he was in his own country,that "of all men this king is the most humble, and of all men he most loves justice."

Some of the historians opine that the Sultan's Mongol policy was a great failure. An amazing report concerning the cowardice and humiliation of the Sultan comes from Firishta. The information that Firishta gives on this head amounts to this, that in the year 1327, Tarmashirin, the Mongol leader of Tronsoxiana, marched with a huge army upon India with a view to conquering it, and overran the country from Multan to Delhi Muhammud-Bin-Tughlug was obliged to purchase peace by giving the invader as much wealth as he wanted. Tarmashirin then, withdrew.

Tarmashirin's invasion found no place in Barani's records. Yahiya-bin-Ahmad maintains that Tarmashirin invaded Delhi in 1328, and overran many parts including Lahorea nd Samana. He reached the Jumna, where he encamped, and then retired by the same route.

Ibn Batutah tells us that Muhammad-Bin Tughlug was extremely kind to Tarmashirin, and that brotherly relations subsisted between the two, The traveller, on his way from Khurasan to India, met Tarmashirin and lived with him for two months. But, he does not mention any invasion. He gives an interesting story about his last days which throws some important light on these affairs. According to him, a conspiracy overthrew Tarmashirin Khan, the then king of Transoxiana, and he fled to India in disguise.

Tarmashirin was identified. He had his Mongol tribesmen with him. So he looked like an invader. According to the story, the arrival of Tarmashirin's subjects in Delhi being reported to the

emperor, he had Tarmashirin exiled. But he awarded him 5,000 dinars.

Nothing definite can be said about this so-called Mongol invasion. The contemporary chroniclers differed in this and obviously any view, solely based on any one of these chronicles is bound to be highly speculative. Was there an invansion at all ? Was Tarmashirin a refugee king asking help from Muhammud-bin-Tughlug ? Was there a battle at all ? Did the sultan buy peace ? All these questions await further researches. Had there been any massive invasion, why did not Barani mention it – for it was a good opportunity to descredit the sultan ? On the other hand, he emphasizes with all the force he can command that Muhammud bin-Tughlug's power and vigour in the opening years of the reign were supreme. The fact is that, it will be unwise to pass any adverse verdict on the sultan. when nothing about it is certain and knowledge is but speculation.

Muhammad-bin-Tughlug once made preparations for the conquest of Khurasan and Iraq, and for this, he is called by many historians a vissionary. But, in fact, there was nothing fantastic or absurd in this plan. The sultan, according to Barani, raised an army 370,000 strong, and kept them for one full year, In fact, when the sultan took up the plan the condition of Khurasan under Abu Said had become highly unsatisfactory. Muhammad had cordial relations with the ruler of Egypt and, with his help, it would not have been difficult to conquer Iraq. But the scheme did not materalise.

The reason lay in the changes that had come about in the diplomatic and political history of Persia, Egypt and Transoxiana. Friendly relations between Abu Said of Persia and An-Nasir of Egypt had been restored. As a result, the coalition broke up. Unaided, the sultan could not undertake the expedition, and hence, with great practical sense and wisdom, he abandoned the scheme. It may be mentioned here that in 1646, the Mughal emperor, Shahjahan, attempted to conquer Central Asia (Balkh) but he failed for the absencee of local help in that region. Muhammad-bin-Tughlug could fores that the expedition would be a failure if the ruler of Egypt did not help him and his abandonement of the scheme is fully reasonable.

Another project which has brought much odium upon the Sultan is that for the conquest of China The critics have relied on

Firishta's account, which says, "Having heard of the great wealth of China, Muhammad Tughlug conceived the idea of subduing that empire ; but in order to accomplish his design it was found necessary first to conquer the country of Himachal." Barani has mentioned it as a part of the Khurasn expedition. He tells us that sultan resolved to conquer Khurasan and so thought it necessary to bring under the dominion of Islam, "This mountain which lies between the territories of India and those of China so that the passage of soldiers and the march of the army might be rendered easy." But, this view cannot be acccepted because the Quarajal mountain was no barrier in the way to Khorasan.

The Kitab-ur-Rihlah helps us to establish the objective of the Quarajal expedition. It says that Quarajal was held by one of the most powerful rulers; It is evident from the Tarikh-i-Mubarak Shahi that the hills of Kumaon served as the place of refuge for the rebels against the government of Delhi. The Quarajal expedition seems to have been sent to complete the chain of fortsfications in the north.

A large army, 80,000 according to Badauni, and a lakh, according to Isami was sent. The first attack of the imperialists was a success, but when the rainy season set in the troops became demoralised and it became impossible to obtain supplies from head-quarters. The troops suffered heavily and the entire baggage of the army was plundered by the wily mountaineers. Only ten horsemen returned to tell the story of this terrible disaster. The sultan cannot be blamed for the great disaster to army. Severe rain, strange diseases—could all these be anticipated by the sultan ? It may be noted that the object of the expedition was realised the ruler of Quarajal acknowledged the authority of Delhi.

Destiny allowed no respite to this unlucky monarch. From 1335 started a series of rebeltions and with energy and superhuman efforts, the sultan rushed from one place to another to put down them. But, his empire was vast, his officers were corrupt orthodox were his enemies, and communication was poor. The sultan was all alone ; yet he did not abandon his task in despair. At last, in 1351, death relieved this idealist sultan from the unsympathetic subjects over whom he had ruled.

Editorial

Nineteen sixty-nine marks a turning point in the history of India. Two years ago, the flame of India's people's democratic revolution was kindled by peasant revolutionaries of Naxalbari area. By now, this flame has spread like a prarie fire in eight provinces of India, dealing mighty blows at the brutal feudal and imperialist exploitation exercised by the land lords in the countryside and the American, British and Soviet imperialists operating through their faithful lackey, the reactionary Indian government, and through the comprador-bureaucrat bourgeoisie. Under the leadership of the Communist Party of India (Marxist-Leninist) red political power has emerged in Srikakulum district of Andhra Pradesh. The ruling classes are now in deep economic and political crises and the revolutionary situation is more excellent than ever. Like the Congress, the Dangeite renegades and neo-revisionists—Ranadive Sundaraya and Co. have proved to be running dogs of imperialism and domestic reaction by their bloody suppression of armed struggles in Naxalbari and elsewhere, and by their preaching of the humbug of "parliamentary road", "immature revolutionary situation" etc.

Defying all these, under the guidance of the invincible thought of Mao Tse-Tung, the Indian people have finally embarked on the only correct road for the Indian revolution—the road to seize political power by armed force.

We expect Marxist writers to use their pens as weapons for this struggle for liberation, to serve the cause of smashing this age-old social, political and cultural set-up by striking at its root. Therefore our task is to wage a decisive battle against bourgeois literature and art and the ugly Yankee culture which favour the existence of this set-up. Our College Magazine is intended to help fighting this battle.

Under the brilliant light of Marxism-Leninism-Mao Tse-Tung's thought, the revolutionary people of India will surely score still greater victories in their future struggle ! In spite of the fact that the Indian revolutionary struggle may be protracted and tortuous, the Indian people will gain the final victory in the revolution. That is certain. A new India with genuine independence and people's democracy will certainly emerge in the East !

PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Editors :

1914-15	Pramatha Nath Banerjee, B. A.
1915-17	Mohit Kumar Sen Gupta, B. A.
1917-18	Saroj Kumar Das, B. A.
1918-19	Amiya Kumar Sen, B. A.
1919-20	Mahmood Hassan, B. A.
1920-21	Phiroze E. Dastoor, B. A.
1921-22	Syama Prasad Mookherjee. B. A.
1921-22	Brajakanta Guha, B. A.
1922- 23	Uma Prasad Mookherjee
1923-24	Subodh Chandra Sen Gupta
1924-25	Subodh Chandra Sen Cupta, B. A.
1925-26	Asit Krishna Mukherjee, B. A.
1926-27	Humayun Z. A. Kabir, B. A.
1927-28	Hirendranath Mukherjee, B. A.
1928-29	Sunit Kumar Indra, B. A.
1929-30	Taraknath Sen, B. A.
1930-31	Bhabatosh Dutta, B. A.
1931-32	Ajit Nath Roy, B. A.
1932-33	Sachindra Kumar Majumdar, B. A.
1933-34	Nikhilnath Chakravarty, B. A.
1934-35	Ardhendu Bakshi, B. A.
1935-36	Kalidas Lahiri, B. A.
1936-37	Asoke Mitra, B. A.
1937-38	Bimal Chandra Sinha, B. A.
1938-39	Pratap Chandra Sen, B. A.
1938-39	Nirmal Chandra Sen Gupta, B. A.
1939-40	A. Q. M. Mahiuddin, B. A.
1940-41	Manilal Banerjee, B. A.
1941-42	Arun Banerjee, B. A.
1942-46	No publication due to Govt. Circular Re. Paper Economy
1947-48	Sudhindranath Gupta, B. A.
1948-49	Subir Kumar Sen, B. A.
1949-50	Dilip Kumar Kar, B. A.
1950-51	Kamal Kumar Ghatak, B. A.

1951-52 Sipra Sarkar, B. A.
1952-53 Arun Kumar Das Gupta, B. A.
1953-54 Ashin Das Gupta, B. A.
1954-55 Sukhamoy Chakravarty, B. A.
1955-56 Amiya Kumar Sen, B. A.
1956-57 Asoke Kumar Chatterjee, B. A.
1957-58 Asoke Sanjay Guha, B. A.
1958-59 Ketaki Kushari, B. A.
1959-60 Gayatri Chakravarty, B. A.
1960-61 Tapan Kumar Chakravarti, B. A.
1961-62 Gautam Chakravarty, B. A.
1962-63 Badal Mukherji, B. A.
Mihir Ranjan Bhattacharyya, B. A.
1963-64 Pranab Kumar Chatterjee. B. A.
1964-65 Subhas Basu, B. A.
195-66 No Publication.
1966-67 Sanjay Kshetry, B. A.
1968-69 Abhijit Sen, A. B.

PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Secretaries :

1914-15 Jogesh Chandra Chakravarti, B. A.
1915-17 Parfulla Kumar Sircar, B. A.
1917-18 Mahmood Hasan, B. A.
1919-20 Paran Chandra Gangooli, B. A.
1920-21 Syama Prasad Mookerjee
1921-22 Bimal Kumar Bhattacharyya
1921-22 Uma Prasad Mookerjee
1922-23 Akshay Kumar Sirkar
1923-24 Bimala Prasad Mukherjee
1924-25 Bijoy Lal Lahiri
1926-27 Lokes Chandra Guha Roy
1927-28 Sunit Kumar Indra
1928-29 Syed Mahbub Murshed
1929-31 Ajit Nath Roy
1931-33 Nirmal Kumar Bhattacharjee
1933-34 Girindra Nath Chakravarti
1934-35 Sudhir Kumar Ghosh
1935-36 Provat Kumar Sircar
1936-37 Arun Kumar Chandra
1937-38 Ram Chandra Mukherjee
1938-39 Abu Sayeed Chowdhury

1939-40	Bimal Chandra Datta, B. A.
1940-41	Prabhat Prasun Modak, B. A.
1941-42	Golam Karim
1942-46	No publication due to Govt. Circular Re. Paper Economy
1946-47	Jibanlal Dev
1947-48	Nirmal Kumar Sarkar
1948-49	Bangendu Gangopadhyay
1949-50	Sourindramohan Chakravarty
1950-51	Manas Mukutmani
1951-52	Kalyan Kumar Das Gupta
1952-53	Jyotirmoy Pal Chaudhury
1953-54	Pradip Kumar Das
1954-55	Pradeep Kumar Sarbadhikari
1955-56	Debendra Nath Banerjee
1956-57	Subal Das Gupta
1957-58	Debaki Nandan Mondal
1958-59	Tapan Kumar Lahiri
1959-60	Rupendu Majumdar
1960-61	Ashim Chatterjee
1961-62	Ajoy Kumar Banerjee
1962-63	Alok Kumar Mukherjee
1963-64	Pritis Nandy
1964-65	Biswanath Maity
1965-66	No Publication.
1966-67	Gautam Bhadra
1968-69	Rebanta Ghose

Statement about wonership and other particulars of the Presidency College Magazine :—

1.	Place of publication	...	Calcutta.
2.	Periodicity of publication	...	Yearly.
3.	Printer's Name	...	Principal, Presidency College.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	86/1, College Street, Calcutta-12.
4.	Publisher's Name	...	Principal, Presidency College.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	86/1, College Street, Calcutta-12.
5.	Secretary's Name	...	Rebanta Ghose
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	Akhanbazar, Chinsura.
6.	Names and Addresses of the individuals who own the publication	...	Presidency College.

I, Rebanta Ghose, declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd./ Rebanta Ghose
Secretary
Presidency College Magazine

দি ইন্‌টার ন্যাশনাল

জাগো জাগো জাগো সর্বহারা
অনশন বন্দী ক্রীতদাস
শ্রমিক দিয়াছে আজ সাড়া
উঠিয়াছে মুক্তির আশ্বাস।
সনাতন জীর্ণ কু-আচার
চুর্ণ-করি জাগো জনগণ
ঘুচাও এ দৈন্য হাহাকার
জীবন মরণ করি পণ।
শেষ যুদ্ধ শুরু আজি কমরেড
এসো মোরা মিলি এক সাথ
গাও ইণ্টার ন্যাশনাল
মিলাবে মানব জাত।